আক্বায়েদ শিক্ষা

প্রথম খণ্ড

মূলঃ আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و اله الطاهرين. لاسيما بقية الله فى الارضين عجل الله تعالى فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره.

মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তা সকল মূল্যবোধ ও সুশৃংখল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে এবং সচেতন অথবা প্রায় সচেতনভাবে মানুষের আচার- ব্যবহারের উপর প্রভাব ফেলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও রীতি- নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে, যেগুলো এ বিশালদেহী বৃক্ষের মূল বলে পরিগণিত। আর এর মাধ্যমে সুমিষ্ট ও মনোমুগ্ধকর ফল ধারণ করতঃ দু'জগতের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধিত হয় ।

এ কারণেই ইসলামী চিন্তাবিদগণ, ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতাব্দীতেই বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেছেন। যেমনঃ কালামশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন পর্যায়ের কালামশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালেও নব নব বিভিন্ন অনুপপত্তির উপর ভিত্তি করে(ঐগুলোর জবাব দানের জন্যে) একাধিক পুস্তক লেখা হয়েছে ও সকলের হাতের নাগালে রাখা–হয়েছে । কিন্তু প্রায়শঃই এ সকল পুস্তক দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্তরের জন্যে প্রণয়ন করা হয় । এর একটি হলঃ সাধারণ স্তরের জন্যে যা অপেক্ষাকৃত সহজ- সরল ভাষায় ও অধিক ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত হয়; আর অপরটি হলঃ বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর জন্যে, যা জটিল ও তত্ত্বীয় পরিভাষায় বর্ণিত হয়। তবে মধ্যবর্তী স্তরের পাঠকশ্রেণীর জন্যে উপযুক্ত পুস্তকের স্থান শূন্য পড়ে আছে। আর এজন্যে বর্ষ পরস্পরায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এধরনের পুস্তকের অভাব অনুভব করছে।

ফলে 'ইসলামী প্রচার সংস্থার ' দায়িত্বশীলদের পরামর্শক্রমে এবং 'দার রাহে হাক ' নামক প্রতিষ্ঠানের একদল বিশেষজ্ঞের সহযোগীতায় এ পুস্তকটি প্রণয়নের উদ্দোগ নিই । এ পুস্তকটির— বিশেষত্ব হল নিম্নরূপঃ

১। পুস্তকের বিষয়- বস্তু যৌক্তিক বিন্যাস ব্যবস্থার আলোকে শৃংখলিত করার এবং যথাসম্ভব কোন বিষয়ের আলোচনা পরবর্তী পাঠের উপর ন্যস্ত না করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২। পারতপক্ষে সুস্পষ্ট ও সরল ভাষা ব্যবহার করার এবং জটিল ও সংকটময় পরিভাষাগুলো পরিহার করার চেষ্টা করেছি। আর সেই সাথে চেষ্টা করেছি সহজবোধ্য অর্থসমূহকে সাহিত্যালংকারের জন্যে উৎসর্গ না করার ।

৩। কোন বিষয়ের প্রতিপাদনের জন্য নিশ্চিত ও অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট দলিলসমূহ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি । আর একাধিক দলিলের সমাহারকরণ ও দুর্বল দলিলের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি ।

৪। অনুরূপ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকেছি, যাবি দ্যানুরাগীদের ধর্যচ্যুতির কারণ হয়। অতএব আশানুরূপ সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি ।

৫। যেহেতু এ পুস্তকটি মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই– জটিল ও সুকঠিন দলিল, যেগুলোর জন্যে দর্শন, তাফসির অথবা হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয়, সেগুলোর উপস্থাপনা থেকে বিরত থেকেছি। জরুরী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছি এবং ঐ বিষয়ের অন্যান্য সম্পূরক অংশের জন্যে অপর পুস্তকসমূহে অনুসন্ধানের–পরামর্শ দিয়েছি, যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুসন্ধান ও গবেষণার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

৬। পুস্তকের বিষয় বস্তু স্বতন্ত্র পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে এবং মোটামুটি প্রত্যেকটি পাঠে সংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তুকে স্থান দেয়া হয়েছে।

৭। কোন কোন পাঠের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে পরবর্তী পাঠে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনোবা পুনব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে বিষয়টি উত্তমরূপে স্থান লাভ করে।

৮। প্রতিটি পাঠের শেষে প্রশ্নমালা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের পথে সহায়ক হবে। (অনুবাদের সময় ঐগুলো উল্লেখ করা হয় নি)। নিসন্দেহে এ বইটিও ভুল- ত্রুটির উর্ধ্বে নয় এবং আশা করি সম্মানিত শিক্ষমন্ডলীর পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সংস্করণে ঐগুলোকে পরিহার করা হবে ।

পবিত্র ওয়ালী আসরের দরবারে (আমাদের জীবন তাঁর নিমিত্ত উৎসর্গকৃত , আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব তরান্বিত করুন) এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মহিমান্বিত শহীদগণের নিকট আমাদের ঋণের বোঝা হয়ত কিছুটা লাঘব হবে এ প্রত্যাশা রইল ।

কোম- মোহাম্মদ তাকী মিসবাহ ইয়াযদী

শাহরিয়ার ১৩৬৫ সৌর বর্ষ

প্রথম খণ্ড

খোদা পরিচিতি

১ম পাঠ

দ্বীন অর্থ কী

দ্বীনের ধারণাঃ

এ বইয়ের উদ্দেশ্য হল , ইসলামী মতবিশ্বাসের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করা যাকে পারিভাষিক অর্থে ‘দ্বীনের মূলনীতি ’ বলা হয়ে থাকে । ফলে ‘দ্বীন ’ (دين) শব্দটি ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পরিভাষাসমূহের উপর সর্বাগ্রে সংক্ষিপ্তরূপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব । কারণ, যুক্তিশাস্ত্রের মতে কোন বিষয়ের সংজ্ঞাসমূহের স্থান সর্বশীর্ষে।

‘দ্বীন ’ একটি আরবী শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ হল অনুসরণ, প্রতিদান ইত্যাদি। পরিভাষাগত অর্থে, মানুষ ও বিশ্বের জন্যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি- নিষেধ হল ‘দ্বীন ’ । দ্বীনের এ সংজ্ঞানুসারে, যারা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী এবং সৃষ্টসমূহের সৃষ্টিকে সাংঘর্ষিক অথবা শুধুমাত্র প্রকৃতি ও পদার্থসমূহের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ফল বলে মনে করেন, তারা বিধর্মী বলে পরিচিত । আর যারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন, তাদের মতাদর্শ ও ধর্মানুষ্ঠানগুলো যতই সবিচ্যুতি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক না কেন, তারা সধর্মী বলে পরিগণিত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মসমূহকে সত্যধর্ম ও মিথ্যাধর্মে বিভক্ত করা যায় ।

অতএব সত্যধর্ম বলতে বুঝায়ঃ যে ধর্ম সত্যানুসারে ও সঠিক মত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতএবং যে সকল আচার- ব্যবহার পর্যাপ্ত যুক্তি- প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিক ও আস্থাশীল বলে পরিগণিত সে সকল আচার- ব্যবহারের ব্যাপারে সুপারিশ ও গুরুত্ব প্রদান করে ।

দ্বীনের মৌলাংশ ও গৌণাংশ

দ্বীনের পারিভাষিক ধারণার ভিত্তিতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি দ্বীনই কমপক্ষে দু'টি অংশ নিয়ে গঠিতঃ-

১। যে সকল বিশ্বাসের উপর দ্বীনের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

২। ঐ মূলভিত্তিসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচী ।

অতএব, যথার্থই বলা যায় যে, 'মতবিশ্বাস' হল, দ্বীনের মূল অংশ এবং বিধি- নিষেধ হল দ্বীনের গৌণ অংশ। যেমনঃ ইসলামী পন্ডিতগণ এ দু'টি পরিভাষাকে ইসলামী মতবিশ্বাস ও বিধি- নিষেধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন ।

বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শঃ-

বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শ এ পরিভাষাগুলো প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থকে সাধারণতঃ বিশ্বদৃষ্টি বলতে বুঝায় : বিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কিত এক শ্রেণীর সামগ্রিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে এক শ্রেণীর সামগ্রিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি। আর মতাদর্শ বলতে বুঝায় : মানুষের আচার- ব্যবহার সম্পর্কে এক শ্রেণীর সামগ্রিক মতামত ।

উপরোল্লিখিত অর্থানুসারে কোন দ্বীনের মৌলিক ও বিশ্বাসগত বিষয়গুলোকে ঐ দ্বীনের বিশ্বদৃষ্টি এবং দ্বীনের সামগ্রিক বিধি- নিষেধগত বিষয়গুলোকে ঐ দ্বীনের মতাদর্শ বলে মনে করা যেতে পারে। অনুরূপ তাদেরকে দ্বীনের মৌলাংশ ও গৌনাংশ রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে । কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মতাদর্শ পরিভাষাটি আংশিক বিধি- নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেরূপ বিশ্বদৃষ্টিও আংশিক বিশ্বাসসমূহকে সমন্বয় করেনা ।

উল্লেখ্য, 'মতাদর্শ ' শব্দটি কখনো কখনো সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয় । তখন বিশ্বদৃষ্টিও এর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয় ।

ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি ও বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি

মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বদৃষ্টি বিদ্যমান ছিল এবং এখনও বর্তমান। তবে অতি প্রাকৃতিক বিষয়কে গ্রহণ ও বর্জনের উপর ভিত্তি করে এগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় :
ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি এবং বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি।
পূর্বে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির অনুসারীদেরকে প্রকৃতিবাদী,এ্যাথিষ্ট (Atheist) কখনো কখনো দ্বৈতবাদী (Dualist) ও নাস্তিক বলা হত। বর্তমানে তাদেরকে বস্তুবাদী বা Materialist নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।
বস্তুবাদের বিভিন্ন শাখা -প্রশাখা রয়েছে। তবে, অধুনা এগুলোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) সর্বাধিক পরিচিত, যা মার্কসিজমের দর্শনকে রূপদান করেছে। ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে যে,বিশ্বদৃষ্টির পরিধি দ্বীনের বিশ্বাসগত অংশ অর্থাৎ আক্বায়েদ অপেক্ষা বিস্তৃততর। কারণ,তা নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী বিশ্বাসকেও সমন্বিত করে থাকে। অনুরূপ,মতাদর্শ পরিভাষাটিও শুধুমাত্র দ্বীনের সমগ্র বিধি- নিষেধের জন্যেই ব্যবহৃত হয়না ।

ঐশী ধর্মসমূহ এবং তাদের মূলনীতিসমূহ

বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তির স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান । তবে, ইসলামী উৎস থেকে যতটুকু জানা সম্ভব, তার ভিত্তিতে বলা যায় : মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথেই ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আঃ) স্বয়ং আল্লাহর নবী , তাওহীদের প্রবক্তা এবং একেশ্বরবাদী ছিলেন। আর অংশীবাদী ধর্মসমূহ সর্বদা বিচ্যুতি এবং সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত লোভ- লালসার ফলে উৎপত্তি লাভ করেছিল ।[১]
একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক ধর্মসমূহও বটে, সেগুলো সত্যধর্ম বলে পরিগণিত। এ ধর্মগুলো তিনটি সামগ্রিক মূলে অভিন্ন । যথাঃ

(১) একক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস।

(২)প্রতিটি মানুষের জন্যে পরকালীন অনন্ত জীবন আছে বলে বিশ্বাস ও পার্থিব কর্মের জন্যে অর্জিত কর্মফল গ্রহণের (দিবসের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(৩) পরম উৎকর্ষ সাধন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথে মানুষকে পরিচালনার জন্যে মহান প্রভুর নিকট থেকে নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন বলে বিশ্বাস স্থাপন।

এ মূলত্রয় প্রকৃতপক্ষে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন, যা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষের বিবেকেই বিদ্যমান তারই জবাব মাত্র। প্রশ্নত্রয় নিম্নরূপ :

(১) অস্তিত্ব দান করেন কে ?

(২)জীবনের শেষে কী রয়েছে ?

(৩) কিরূপে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ?

প্রসঙ্গতঃ ওহীর মাধ্যমে জীবন- কর্মসূচীর যে বিষয়- বস্তু নিশ্চিতরূপ লাভ করেছে, সত্যিকার অর্থে তা- ই হল সে ধর্মীয় মতাদর্শ যা ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত ।

অপরিহার্য বিষয়সমূহ , অবিচ্ছেদ্য বিষয়সমূহ , নির্ভরশীল বিষয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণসমূহ, যেগুলি সামগ্রিকভাবে দ্বীনের বিশ্বাস সমষ্টিকে রূপায়িত করে সেগুলির সমন্বয়ে মৌলিক মতবিশ্বাস গঠিত। আর বিশ্বাসসমূহের বসাদৃশ্যই হল একাধিক ধর্ম, ধর্মীয় দল- উপদল ও মাযহাবের উৎপত্তির কারণ। যেমন : কোন কোন নবীগণের (আঃ) নবুয়্যতের ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণেই ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে এবং তাদের মতবিশ্বাস ও আচার- অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি কোন কোন বিষয়, মৌলিক মতবিশ্বাসের (প্রকৃত) সাথেও অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। যেমন : খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, একেশ্বরবাদের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিহীন; যদিও তারা এর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। অনুরূপ রাসুল (সঃ) - এর উত্তরসূরী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হবেন, না জনগণ নির্বাচন করবে?' এ বিষয়ের উপর মতবিরোধের ফলেই শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের মধ্যে বসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে ।

উপসংহারে বলা যায়, তাওহীদ, নবুয়্যত এবং পুনরুত্থান দিবস, এ তিনটি হচ্ছে প্রত্যেক ঐশ্বরিক ধর্মেরই মৌলিকতম বিশ্বাস। তবে এ মূলত্রয়ের বিশ্লেষণের ফলে অর্জিত অথবা তাদের অধীনস্থ অন্যান্য বিশ্বাসসমূহকেও বিশেষ পারিভাষিক অর্থে মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করা যেতে পারে। যেমন : খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসকে একটি মৌলিক বিশ্বাস এবং তাঁর একত্বকে অপর একটি মৌলিক বিশ্বাস হিসাবে মনে করা যেতে পারে । অথবা নবুয়্যতের বিশ্বাসকে সকল ধর্মেরই মৌলাংশ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)- এর নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাসকে ইসলামের অপর একটি মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করা যেতে পারে । যেমন : কোন কোন শিয়া পন্ডিত ন্যায়পরায়ণতাকে (العدل) একটি স্বতন্ত্র মূল হিসাবে মনে করেন, যদিও এটা তাওহীদেরইএকটি শাখা । অনুরূপ, নবুয়্যতের অধীন হওয়া সত্ত্বেও ইমামতকে আলাদা একটি মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এধরনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'মৌলিক ' শব্দটির ব্যবহার একান্তই পারিভাষিক ও পারস্পরিক সম্মতিভিত্তিক। ফলে, এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই ।

অতএব, 'দ্বীনের মৌলাংশ ' শব্দটিকে সাধারণ ও বিশেষ এ দু'টি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'মৌলাংশ ' পরিভাষাটির সাধারণ অর্থ 'দ্বীনের গৌণাংশ ' অর্থাৎ বিধি- নিষেধ অংশের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং নির্ভরযোগ্য সকল মতবিশ্বাসকে সমন্বয় করে থাকে। আর তার বিশেষ অর্থটি দ্বীনের মৌলিকতম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনুরূপ, মৌলিক বিশ্বাসত্রয়ের মত সকল ঐশী ধর্মের অভিন্ন বিশ্বাসকে (তাওহীদ, নবুয়্যত, পুনরুত্থন দিবস) দ্বীনের মৌলাংশ (নিরঙ্কুশভাবে) এবং তাদের সাথে অপর এক বা একাধিক মৌলিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে 'দ্বীনের বিশেষ মৌলাংশ ' অথবা এক বা একাধিক বিশ্বাস , যেগুলো মাযহাব বা ফিরকার বিশেষত্ব, সেগুলোর সংযোজনের মাধ্যমে কোন মাযহাবের মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করা হয়।

২য় পাঠ

দ্বীনের অনুসন্ধানের

দ্বীনের অনুসন্ধানের উদ্দীপকসমূহ

বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচয় লাভ এবং সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সহজাত প্রবৃত্তি ও ফিতরাতগত চাহিদা মানুষের আত্মিক বিশেষত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক মানুষের শশবে প্রকাশ লাভ করে এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় থাকে। সত্যানুসন্ধিৎসু এ ফিতরাতকে কখনো কখনো 'অনুসন্ধিৎসু ইন্দ্রিয়ও' বলা হয়ে থাকে। এ ফিতরাত মানুষকে দ্বীনের কাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে এবং সত্য ধর্মকে চিনার জন্যে উদ্যোগী করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য :

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা বহির্ভূত এবং অবস্তুগত (অদৃশ্য) কোন বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে কি ? যদি থেকে থাকে, তবে অদৃশ্য জগৎ ও বস্তুজগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক বিদ্যমান? যদি সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বহির্ভূত এমন কোন অস্তিত্ব কি বিদ্যমান, যা বস্তুজগতের সৃষ্টিকর্তা ?

মানুষের অস্তিত্ব কি শুধুমাত্র এ বস্তুগত দেহের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং তার জীবন কি শুধুমাত্র এ পার্থিব জীবনেরও মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না কি অপর কোন জীবনের অস্তিত্বও রয়েছে ? যদি অপর কোন জীবনের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে ইহ ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? যদি সম্পর্ক থেকে থাকে তবে পার্থিব কোন্ কোন্ বিষয়গুলো পারলৌকিক বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে থাকে ? কিভাবে মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দানকারী সঠিক কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে? সর্বশেষে, ঐ কর্মসূচীটি কী ?

অতএব, সত্যানুসন্ধিৎসু সহজাত প্রবৃত্তিই হল প্রধান কারণ যা মানুষকে সকল বিষয়ের উপর বিশেষ করে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর পর্যালোচনার এবং সত্য দ্বীনকে চিনার জন্যে উদ্যোগী করে।

অপর একটি কারণ, যা সত্যানুসন্ধানের প্রতি মানুষের আগ্রহকে বৃদ্ধি করে তা হল সত্যানুসন্ধিৎসা ভিন্ন অপর এক বা এশাধিক ফিতরাতগত কামনা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট চাহিদাসমূহ

পুরণের প্রবণতা, যা বিশেষ পরিচিতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : বিভিন্ন বস্তুগত ও পার্থিব বভব থেকে লাভবান হওয়ার প্রবণতা যা বজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির মাধ্যমে মানুষকে তার কাংখিত চাহিদা পুরণে সহায়তা করে। অনুরূপ, দ্বীন যদি মানুষের আকাংখা পুরণের, স্বার্থ ও কল্যাণের এবং বিপদ- আপদ ও ক্ষয়- ক্ষতির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিতে পারে, তবে তার জন্যে তাও বাঞ্ছিত হবে।

লাভবান হওয়ার সহজাত প্রবণতা এবং ক্ষতির হাত থেকে পলায়ন প্রবণতা দ্বীন সম্পর্কে অনুসন্ধানের অপর একটি কারণ বলে পরিগণিত । তবে জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি এবং সকল প্রকার বাস্তবতাকে জানার জন্য পর্যপ্ত শর্ত কার্যকর না থাকার ফলে সম্ভবতঃ মানুষ এমন কোন বিষয়কে অনুসন্ধানের জন্যে নির্বাচন করে থাকে যার সমাধান সহজতর এবং যার ফল সহজলভ্য ও অনুভবযোগ্য। অপর দিকে দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সমাধান জটিলতর ও কার্যকর কোন গুরুত্বপূর্ণ ফল নেই। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকে। ফলে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়সমূহই বিচার- বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ববহ। এমন কি কোন বিষয়ই বিচার- বিশ্লেষণের জন্যে এ বিষয়গুলোর সমতুল গুরুত্ব রাখে না।

এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ও মনোসমীক্ষক বিশ্বাস করেন যে, খোদাভীরুতা হল মানুষের একটি প্রত্যক্ষ ফিতরাতগত চাহিদা এবং তার উৎসকে ধর্মানুভূতি (حس دینی) নামকরণ করতঃ তাকে অনুসন্ধিৎসা, কল্যাণানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতির পাশাপাশি চতুর্থ আত্মিক বশিষ্ট্যরূপে গণনা করেছেন।

তারা তাদের এ ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং বলেছেন যে, খোদাভীরুতা সবর্দা কোন না কোনভাবে সর্বযুগের মানুষের মধ্যে সর্বদা প্রচলিত ছিল। আর এ সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতাই খোদাভীরুতার ফিতরাতগত হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ।

তবে ফিতরাতগত চাহিদার সার্বজনীন অর্থ এ নয় যে, এটা সর্বদা সর্বজনের মধ্যে জাগ্রত ও সজীব থাকবে এবং মানুষকে সতর্কতার সাথে আপন যাঞ্চার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। বরং তা পারিপার্শিক পরিবেশ ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচর্যার কারণে নিস্প্রভ ও নিস্ক্রিয়ও হয়ে যেতে পারে কিংবা আপন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে, যেমনি করে অন্যান্য সহজাত প্রবণতার ক্ষেত্রে এধরনের নিস্প্রভতা, বিচ্যুতি ও অবদমিত অবস্থা কমবেশী পরিলক্ষিত হয়।

এ মতবাদ অনুসারে, দ্বীনের অনুসন্ধানের উদ্দীপক হল প্রত্যক্ষভাবে ফিতরাতগত এবং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে এর অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই ।

এ মতবাদকে দ্বীনের ফিতরাতগত হওয়া সম্পর্কিত আয়াত এবং রেওয়ায়েতের উদ্বৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে। তবে এ ফিতরাতগত চাহিদা অবচেতন অবস্থায় প্রকাশ পায় ' –এ ধারণার উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ তর্ক- বিতর্কের খাতিরে নিজের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে। তাই আমরা শুধুমাত্র এ যুক্তিতেই তুষ্ট হব না এবং দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব প্রমাণ করতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করব।

দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে বাস্তবতাকে চিনার জন্যে ফিতরাতগত চাহিদা, অপরদিকে স্বার্থসিদ্ধি ও লাভবান হওয়ার, ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদে থাকার প্রবণতা হল চিন্তা করার জন্যে এবং গভীর জ্ঞানার্জনের জন্যে শক্তিশালী উদ্দীপক। অতএব, কোন ব্যক্তি অবহিত হল যে, যুগ যুগ ধরে একশ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দাবী করেছেন যে, "আমরা ইহ ও পরকালীন কল্যাণের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রেরিত হয়েছি" সত্যের বাণী পৌঁছানোর পথে ও মানুষকে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার চেষ্টা করা থেকে বিরত হন নি এবং যে কোন প্রকার দুঃখ- কষ্টকে সহ্য করেছেন; এমনকি এ পথে তারা নিজ জীবনও উৎসর্গ করেছেন। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোল্লিখিত উদ্দীপকদ্বয়ের দ্বারা দ্বীন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে জানতে চেষ্টা করে যে, পয়গাম্বরগণের দাবী কতটা সত্য এবং

কতটা যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি জানতে পারল যে, তাদের (নবীগণের) আহ্বান অনন্ত সুখ ও বভবের সুসংবাদ এবং অনন্তদুঃখ- দুর্দশা ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ তাদের আহবানে সাড়া দেয়ার মধ্যে চিরন্তন সুখ- সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর তাদের আহ্বানের বিরোধিতা করার মধ্যে অনন্ত ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে ঐ ব্যক্তি কোন্ অজুহাতে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা ও শথিল্য প্রদর্শন করবে এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্যে উদ্যোগী হবে না ?

হ্যাঁ, সম্ভবতঃ কেউ অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে পরিশ্রান্ত করতে চান না অথবা দ্বীন গ্রহণ করার কারণে কিছু সীমাবদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে এবং তার কিছু কিছু স্বেচ্ছাচারী কর্ম থেকে তাকে বিরত রাখবে, এ কারণে দ্বীনের অনুসন্ধান থেকে সে নিজেকে দূরে রাখে ।[২]

কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিরা অচিরেই এ অলসতা ও স্বেচ্ছাচারিতার শোচনীয় পরিণতি দেখতে পাবে এবং পরিশেষে অনন্ত শাস্তি ও অপরিসীম দুর্দশায় পতিত হবে ।

এ ধরনের ব্যক্তিদের অবস্থা অসুস্থ ' ঐ নির্বোধ শিশুর চেয়েও খারাপ যে ঔষধের তিক্ততার ভয়ে চিকিৎসকের নিকট যায় না এবং নিশ্চিত মৃত্যর মুখে নিজেকে ঠেলে দেয়। কারণ ভাল- মন্দের পার্থক্য বুঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ উক্ত শিশুর ঘটেনি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শের বিরোধিতা করার ফলে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের সুখ- স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত হত্তয়া ব কিছু নয়। কিন্ত একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ও সচেতন মানুষ, যে লাভ- লোকসান সম্পর্কে ভাবতে পারগ, সে তো স্বল্পস্থায়ী সুখের বিনিময়ে অনন্ত শাস্তিই ক্রয় করে থাকে ।

এ কারণেই, পবিত্র কোরান এ ধরনের উদাসীন মানুষকে চতুস্পদ প্রাণীর চেয়েও অধম বলে বর্ণনা করেছে। কোরান এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলে :

(أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)

২- তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তা থেকেও অধম; তারাই হচ্ছে গাফেল (সুরা আরাফ- ১৭৯)।

অপর একস্থানে কোরান তাদেরকে নিকৃষ্টতম প্রানীরূপে পরিচয় করিয়ে বলে :

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ)

- নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই নিকৃষ্টতম জীব যারা বধির, বোবা ও যারা বিবেকহীন (সুরা আনফাল - ২২) ।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

হয়ত কেউ কেউ এমন কোন বাহানা দাঁড় করাতে পারেন যে, কোন সমস্যা সমাধানে মানুষ তখনই প্রচেষ্টা চালায়, যখন তা সমাধানের কোন পথ খুজে পাবার আশা থাকে। কিন্তু আমরা দ্বীন ও দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ের ব্যাপারে চিন্তা- ভাবনা করে, কোন ফল পাবার ব্যপারে খুব একটা আশাবাদী নই। ফলে সে সকল কর্মের পেছনেই আমাদের সময় ও শ্রম ব্যয় করায় প্রাধান্য দিব, যেগুলো থেকে ফল পাওয়ার ব্যাপারে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী আশাবাদী।

জবাবে এ ধরনের লোকদেরকে বলতে হয় :

প্রথমতঃ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সমাধানের প্রত্যাশা কোনভাবেই অন্য সকল বজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সমাধানের চেয়ে কম নয়। আমরা জানি যে, এমন অনেক বজ্ঞানিক বিষয় আছে যে, কয়েক দশক অবিরাম প্রচেষ্টার পর সেগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয়েছে ।

দ্বিতীয়তঃ সম্ভাবনার (Probablity) গুরুত্ব কেবলমাত্র এক নির্বাহীর) সম্ভাবনার পরিমাণ(উপরই নির্ভর করে না, বরং সম্ভাব্যতার (Probable) পরিমাণও বিবেচনা করতে হয়। উদাহরণতঃ যদি কোন একটি ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা ৫ %এবং অপর একটিতে সম্ভাবনা ১০ %হয়; কিন্তু যদি প্রথম ব্যবসায় সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ ১০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যবসায় সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ ১০০ টাকা হয়,তবে প্রথম ব্যবসাটি দ্বিতীয় ব্যবসার উপর পাঁচগুণ বেশী গুরুত্ব পাবে,যদিও প্রথম ব্যবসায় সম্ভাবনার পরিমাণ ৫% ছিল যা দ্বিতীয় ব্যবসার সম্ভাবনার (১০%)[৩] অর্ধেক ।

যেহেতু দ্বীনের অনুসন্ধানে সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ অসীম, সুতরাং চূড়ান্ত ফল লাভের সম্ভাবনা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রচেষ্টার গুরুত্ব অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে বেশী। কারণ, ঐগুলোর ফল সীমাবদ্ধ ।

অতএব, একমাত্র তখনই দ্বীন সম্পর্কে অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন মানুষ দ্বীনের অসারতা সম্পর্কে অথবা দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমাধান যোগ্য নয় বলে নিশ্চিত হবে। কিন্তু এ ধরনের নিশ্চয়তা কোথা হতে অর্জিত হবে ?

৩য় পাঠ

প্রকৃত মানুষ হওয়ার শর্ত

ভূমিকা

ইতিপূর্বে আমরা দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং সত্য ধর্মকে চিনার জন্যে প্রচেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তাকে সরল বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছি, যা লাভবান হওয়ার ফিতরাতগত চাহিদা এবং ক্ষতি থেকে দূরে থাকার প্রবণতার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ প্রবণতা প্রত্যেকেরই আভ্যন্তরে বিদ্যমান এবং পারিভাষিক অর্থে, নির্ভুল প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বলিত।[৪]

এখন আমরা ঐ বিষয়টিকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব। তবে এ প্রমাণটি যথার্থ ভূমিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল। ঐ ভূমিকাসমূহের অবশেষ হল এরূপ :

যদি কেউ দ্বীন সম্পর্কে না ভাবে এবং সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস পোষণ না করে তবে মানবিক উৎকর্ষে পৌঁছতে পারবে না। এমনকি তাকে মূলতঃ প্রকৃত মানুষরূপেও মনে করা যাবে না। অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হওয়ার শর্ত হল সঠিক বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শের অনুসারী হওয়া ।

এ প্রমাণটি তিনটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল । যথা :

ক) মানুষ, এমন এক অস্তিত্ব, যে উৎকর্ষে পৌঁছতে চায়।

খ) মানুষের উৎকর্ষ বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর ঐচ্ছিক আচার- ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে ।

গ) বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর কার্যকরী বিধি- বিধান বিশেষ তাত্ত্বিক পরিচিতির আলোকে রূপ লাভ করে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিত্রয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অস্তিত্বের উৎস, জীবনের পরিণতি (পুনরুত্থান) এবং কল্যাণকামী কর্মসূচী লাভের জন্যে অনুমোদিত পথের (নবুয়্যত) শনাক্তকরণ । অর্থাৎ অস্তিত্ব পরিচিতি, মানব পরিচিতি, পথ পরিচিতি।

এখন আমরা উপরোক্ত ভূমিকাত্রয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মানুষ, উৎকর্ষ সাধনে ইচ্ছুক:

যে কেউ তার আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক প্রবণতাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে, এগুলোর অধিকাংশের মূলে রয়েছে উৎকর্ষ সাধন। প্রকৃতপক্ষে কেউই পছন্দ করেনা যে, তার অস্তিত্বে কোন প্রকার ক্রটি থাকুক। আর তাই সে নিজ থেকে সকল প্রকার স্বল্পতা, অপূর্ণতা ও ক্রটি- বিচ্যুতি দূর করে কাংখিত উৎকর্ষে পৌঁছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং ক্রটি- বিচ্যুতি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যের কাছ থেকে তা গোপন করে রাখে।

মানুষের এ প্রবণতা যখন তার আপন ফিত্রাতের পথে পরিচালিত হয় তখন তা তার সকল প্রকার বস্তুগত ও আত্মিক বিকাশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। আর যদি কোন কারণে বা অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের এ প্রবণতা বিচ্যুতির পথে পতিত হয় তবে তা অহংকার, অপরের তুলনায় নিজেকে বড় করে দেখা, প্রশংসা পাগল ইত্যাদি কুবৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশের কারণে পরিণত হয়।

যা হোক, উৎকর্ষ সাধনেচ্ছা হল মানব আত্মার গহীনে অবস্থিত এক শক্তিশালী ফিতরাতগত কারণ। অধিকাংশ সময়ই এর বা এর শাখাসমূহের স্বরূপ সচেতনভাবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হবে যে, এদের সকলেরই মূলে রয়েছে উৎকর্ষ অনুসন্ধিৎসা ।

বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে :

বৃক্ষরাজির পূর্ণতা লাভ, পারিপর্শিক অবস্থা ও বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভরশীল এবং অপরিহার্যরূপে ঘটে থাকে। কোন উদ্ভিদই স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে না এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী ফল দিতে পারে না। কারণ তারা জ্ঞান ও প্রত্যয়ের অধিকারী নয় ।

প্রাণীদের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও পছন্দের কিছুটা স্থান রয়েছে। তবে এ প্রত্যয় প্রাণীর সীমাবদ্ধ পারিপার্শিক চাহিদা ও অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক প্রাণীরই ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুযায়ী স্বল্প বোধশক্তির আলোকে তা পরিগ্রহ করে থাকে ।

কিন্তু মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বশিষ্ট্য ছাড়াও দু'টি স্বতন্ত্র আত্মিক বিশেষত্বের অধিকারী। অর্থাৎ একদিকে মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা শুধুমাত্র পারিপার্শিক আসন্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অপরদিকে তা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে ব্যবহার করে আপন জ্ঞানের পরিধিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তত করতে পারে। আর এ স্বতন্ত্র আত্মিক বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রত্যয় সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সীমানাকে ছাড়িয়ে অসীমে পৌঁছে যেতে পারে।

যেমনি করে উদ্ভিদের বিশেষ উদ্ভিজ্জ শক্তির মাধ্যমে তার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়; যেমনি করে প্রাণিজ উৎকর্ষ তার স্বভাবজাত প্রত্যয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির আশ্রয়ে ঘটে থাকে; তেমনি মানুষের বিশেষ মানবীয় উৎকর্ষ যা প্রকৃতপক্ষে তার আত্মিক বিকাশ, তাও তার সচেতন প্রত্যয়ের আশ্রয়ে এবং বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে অর্জিত হয়ে থাকে । আর মানুষের এ বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের চাহিদার বিভিন্ন স্তরকে শনাক্ত করতে পারে এবং একাধিক চাহিদার সমাহারে, সর্বোৎকৃষ্টকে প্রাধান্য দিতে পারে।

অতএব, আচার- আচরণ, মানবীয় হওয়ার অর্থ হল, মানবীয় বিশেষ ঐচ্ছিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক নির্দেশনায় কার্যকর হওয়া। আর মানুষের যে সকল আচরণ শুধুমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সম্পাদিত হয়, সে সকল আচরণ পাশবিক আচরণরূপে পরিগণিত হয়। যেমন :গতিশক্তির প্রভাবে মানুষের শরীরে যে গতির সঞ্চার হয়, তা শারীরিক শক্তিরূপে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে থাকে ।

বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বিধি -বিধান তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল :

ঐচ্ছিক কর্ম হল, কাংখিত ফলে উপনীত হওয়ার জন্য একটি মাধ্যম। আর তার ঐচ্ছিক মূল্যমান বিবেচিত উদ্দেশ্যের কাম্যতার মর্যাদা এবং আত্মিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে প্রভাবের মাত্রার অনুগামী। অনুরূপ যদি কোন কর্ম আত্মিক উৎকর্ষহীনতার কারণ হয়, তবে ঐ কর্মের মূল্যমান হবে নেতিবাচক।

অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি কেবলমাত্র তখনই ঐচ্ছিক কর্ম সম্পর্কে বিচার ও তার মূল্যমান নির্ধারণ করতে পারবে যখন মানুষের উৎকর্ষ ও এর বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অবগত থাকবে। অর্থাৎ যখন জানবে যে, মানুষ কীরূপ অস্তিত্ব? তার জীবন- পরিধির বিস্তৃতি কতটুকু ? সে উৎকর্ষের কোন স্তরে পৌঁছতে সক্ষম? জানবে যে, মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ কী এবং তার সৃষ্টির পিছনে কী উদ্দেশ্য বিদ্যমান ?

অতএব, সঠিক মতাদর্শের (অর্থাৎ ঐ মূল্যমান ব্যবস্থা যা ঐচ্ছিক কর্মসমূহের মূল্যমান নির্ধারণ করে থাকে) অনুসরণ সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও তার বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের উপর নির্ভর করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়গুলো (অর্থাৎ সঠিক বিশ্বদৃষ্টির বিষয়সমূহ) সমাধান না করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আচার- আচরণের মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না । যেমন : গন্তব্য জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে কোন পথ নির্ধারণ করাও অসম্ভব ।

অতএব, তাত্ত্বিক পরিচিতিসমূহ যেগুলো বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহকে রূপায়িত করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো, মূল্যমান ব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বিধি- বিধানের ভিত্তিরূপে পরিগণিত ।

উপসংহার:

এখন আমরা উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দ্বীনের অনুসন্ধানের এবং সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শকে খুজে বের করার জন্যে, প্রচেষ্টার গুরুত্বকে নিম্নরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারি :

মানুষ ফিতরাতগতভাবেই স্বীয় উৎকর্ষ পিয়াস এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে প্রকৃত উৎকর্ষে পৌঁছতে ইচ্ছুক। কিন্তু যে কর্মগুলো তাকে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী করবে, সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্যে সর্বপথমে তাকে আপন চূড়ান্ত উৎকর্ষকে চিনতে হবে। আর এ চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচিতি, আপন অস্তিত্বের স্বরূপ এবং তার শুরু ও শেষ সম্পর্কে জানার উপর নির্ভর করে। অনুরূপ, বিভিন্ন কর্মের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সম্পর্ক ও উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত

করতে হবে, যাতে স্বীয় মানবীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্যে সঠিক পথকে বেছে নিতে পারে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ তাত্ত্বিক পরিচিতি (বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতি) সম্পর্কে অবহিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক আচার ও রীতি ব্যবস্থাকে (মতাদর্শ) গ্রহণ করতে পারবে না।

অতএব, সত্যধর্মকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা অতি গুরুত্বপর্ণ, যা সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শকেও সমন্বয় করে থাকে এবং এটি ব্যতিরেকে মানবীয় উৎকর্ষে পৌঁছা অসম্ভব। অনুরূপ যে সকল আচার -ব্যবহার উপরোল্লিখিত মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন না হয়, সে সকল আচার - ব্যবহার মানবীয় বলে পরিগণিত হতে পারে না। যারা সত্য ধর্মকে শনাক্তকরণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে চেষ্টা করেন না অথবা শনাক্তকরণের পরও আক্রোশ ও অবাধ্যতাবশতঃ অস্বীকার করার চেষ্টা করেন এবং শুধুমাত্র পাশবিক চাহিদা ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুগত আকর্ষণেই তুষ্ট থাকেন, প্রকৃত পক্ষে তারা পশু ব কিছুই নন। যেমন পবিত্র কোরআন এদের সম্পর্কে বলে :-

(يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ)

“চতুষ্পদ প্রাণীর মত ভোগ ও ভক্ষণ করে (সুরা মুহাম্মদ (সঃ) - ১২)। ”

যেহেতু এ ধরনের ব্যাক্তিরা আপন মানবীয় যোগ্যতাসমূহের বিনাশ ঘটিয়ে থাকে , সেহেতু তারা যথোপযুক্ত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে । পবিত্র কোরানের ভাষায় :

(ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)

“তাদের ভোগ ও ভক্ষণ করতে দাও এবং পার্থিব যত স্বাধ- আকাঙ্খা পূরণ করতে দাও, অচিরেই তারা (এর পরিণাম) দেখতে পাবে (সুরা হিজর- ৩)। ”

৪র্থ পাঠ

বিশ্বদৃষ্টি মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান

ভূমিকা

যখনই মানুষ বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান এবং সত্য ধর্মের মূলনীতির পরিচিতি সম্পর্কে জানতে চাইবে, প্রথমেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে যে, কোন্ পথে এ বিষয়গুলোর সমাধান করতে হবে এবং কিরূপে সঠিক মৌলিক পরিচিতি সম্পর্কে জানা যেতে পারে? মূলতঃ পরিচিতির জন্যে কী কী উপায় বিদ্যমান? এদের কোনটিকে পরিচিতিসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে নির্বাচন করতে হবে ?

এ বিষয়টির কৌশলগত ও পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনা ও পর্যালোচনার দায়িত্ব দর্শনের পরিচিতি বিজ্ঞান (Epistemology) বিভাগের। দর্শনের ঐ বিভাগে মানুষের বিভিন্ন পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করতঃ এদের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এদের সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাব। সুতরাং আমাদের আলোচনা- সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো প্রয়োজনীয়,শুধুমাত্র সেগুলোর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। তবে ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যলোচনা যথাস্থানে করা হবে।[৫]

পরিচিতির প্রকারভেদ :

পরিচিতিসমূহকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। অভিজ্ঞতালব্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরিচিতি) বিশেষ পারিভাষিক অর্থে:(এধরনের পরিচিতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে লাভ করা যায়। তবে বুদ্ধিবৃত্তিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধসমূহের বিমূর্তন (Abstraction) এবং সম্প্রসারণের (Generalization) ক্ষেত্রে স্বীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।[৬]

অভিজ্ঞতালব্ধ ও বজ্ঞানিক পরিচিতি বজ্ঞানিক বিষয়সমূহে যেমন : পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ণ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২। **বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতি**: এধরনের পরিচিতি নির্বস্তুক ধারণার (মা'কুলাতুচ্ছানিয়া) মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে এবং এ পরিচিতিতে বুদ্ধিবৃত্তি মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরীক্ষালব্ধ কোন কোন বিষয়, ধারণা লাভের উৎস অথবা যুক্তি পদ্ধতির কোন কোন প্রতিজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র, এ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত ।

৩। **ধর্মবিশ্বাসগত পরিচিতি** : এধরনের পরিচিতি দ্বিস্তর বিশিষ্ট। বিশ্বস্ত উৎসের পূর্ব পরিচিতির– ভিত্তিতে এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে এধরনের পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে। যে সকল বিষয়সমূহ সকল ধর্মের অনুসারীগণ ধর্মীয় নেতাগণের বক্তব্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকেন, সে সকল বিষয়সমূহ এ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো এধরনের বিষয়বস্তুর বিশ্বস্ততা, ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষালব্ধ বিষয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর।

৪। **প্রত্যক্ষ অনুভূতিভিত্তিক পরিচিতি** : এধরনের পরিচিতি পূর্ববর্তী সকল পরিচিতির ব্যতিক্রম এবং কোন প্রকার মস্তিষ্ক প্রসূত অনুধাবন ও আকৃতির মাধ্যম ব্যতীত অবিকল জ্ঞেয় সত্তার সাথেও সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকে। এধরনের পরিচিতিতে কোন প্রকার ভুল- ত্রুটির স্থান নেই। তবে প্রত্যক্ষ অনুভূতিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক পরিচিতি বলে যা সাধারণতঃ বর্ণিত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তা হল এধরনের পরিচিতির মস্তিষ্কে অংকিত ব্যাখ্যারূপ যা ভুল- ত্রুটি বর্জিত নয়।

বিশ্বদৃষ্টির প্রকারভেদ :

ইতিপূর্বে পরিচিতির যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিশ্বদৃষ্টিকে নিম্নরূপে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১। **বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি**: অর্থাৎ মানুষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয়।

২। দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টি: যা যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

৩। ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টি : যা ধর্মীয় নেতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাদের বক্তব্যকে গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

৪। এরফানী বা আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টি : যা উদ্ভাবন, অন্তর্জ্ঞান ও এশরাক্বীয় পথে অর্জিত হয়ে থাকে।

এখন, দেখতে হবে যে, বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলোকে কি সত্যিকার অর্থে উল্লেখিত চার উপায়ে সমাধান করা সম্ভব? অতঃপর দেখতে হবে, এদের কোন একটির বিশেষত্ব ও অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বিবেচনার পালা আসে কিনা ?

সমালোচনা ও ত্রুটিনির্দেশ :

ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিতি বস্তুগত ও প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর সীমানায় কার্যকর। ফলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিসমূহ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির শনাক্তকরণ সম্ভব নয়। কারণ, এধরনের বিষয়গুলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমাবহির্ভূত এবং কোন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই এ বিষয়গুলোর সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারে না। যেমন : খোদার অস্তিত্বকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বা বর্জন (আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন) করা অসম্ভব। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার হস্ত এত ক্ষুদ্র যে, অতিপ্রকৃতির আঁচলকে স্পর্শ করতে অপারগ এবং আপন বস্তুগত বিষয়ের সীমাবহির্ভূত কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা বা বর্জন করতে অক্ষম।

অতএব, 'ধভিজ্ঞতালব্ধ ও বজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি ' (পারিভাষিক অর্থে বিশ্বদৃষ্টি, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) মরীচিকা ব কিছুই নয়। সুতরাং প্রকৃত অর্থে একে 'বিশ্বদৃষ্টি ' নামকরণ করা যায় না। তবে সর্বোপরি একে 'বস্তুজগত পরিচিতি 'বলা যেতে পারে। এছাড়া এধরনের পরিচিতি বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক প্রশ্নসমূহের জবাব দানেও অক্ষম।

কিন্ত যে সকল পরিচিতি ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় (যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সেগুলো দ্বি- স্তর বিশিষ্ট এবং পূর্বেই ঐগুলোর উৎস বা উৎসসমুহের উপর আস্থা স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে কারো নবুওয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে; অতঃপর তার বাণী বধ বলে পরিগণিত হবে। তবে সর্বাগ্রে বাণী প্রেরক অর্থাৎ মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে হবে । আর এটা সুস্পষ্ট যে, বাণী প্রেরকের মূল অস্তিত্ব এবং তদনুরূপ বাণী বাহকের নবুওয়াতকে বানী নির্ভর দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না। যেমন : বলা যাবে না যে, যেহেতু কোরা'ন বলে 'খোদা আছেন ' সেহেতু তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। তবে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর এবং ইসলামের নবীর শনাক্তকরণ ও কোরা'নের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর, অন্যান্য গৌণ বিশ্বাসসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কার্যকরী বিধি- নিষেধ সমূহও বিশ্বস্ত সংবাদদাতা ও বিশ্বস্তসূত্রের মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে। কিন্ত মৌলিক বিশ্বাসমূহকে তৎপূর্বে অন্য কোন উপায়ে– সমাধান করতে হবে।

অতএব, ধর্মবিশ্বাসগত পরিচিতিও বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহের সমাধানে অক্ষম। তবে এরফানী ও এশরাক্বী (اشراقی) পদ্ধতির ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রয়েছে :

প্রথমতঃ বিশ্বদৃষ্টি হল এক প্রকার পরিচিতি, যা মস্তিষ্কপ্রসূত (ذهنی) ভাবার্থসমূহ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্ত অন্তর্জ্ঞানের ক্ষত্রে মস্তিষ্কপ্রসূত বোধদ্বয়ের কোন স্থান নেই। অতএব এ ধরনের ভাবার্থসমূহকে অন্তর্জ্ঞানের বরাত দেয়া উদাসীনতা ও এর নামান্তর ব কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ অনর্–জ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং ভাষা ও ভাবার্থের কলেবরে তাদের বর্ণনা বিশেষ মানস- দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, যা সুদীর্ঘ সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা এবং দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেঅসম্ভব। যারা এধরনের অভিজ্ঞতার অধিকারী নন প্রকৃতপক্ষে তারা সদৃশ শব্দ ও ভাবার্থকে ব্যবহারকরে থাকেন যা বিচ্যুতি ও বিপথগামিতার এক বৃহত্তর কারণ। তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে যা অন্তর্জ্ঞানের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়, তা মস্তিষ্কে অংকিত তার কল্পিত চিত্র ও বর্ণনা

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এমনকি স্বয়ং অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির জন্যেও ক্রটিযুক্ত হয়ে থাকে।

চতুর্থতঃ ঐ সকল বাস্তবতা, যাদের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাখ্যা বিশ্বদৃষ্টি বলে পরিচিত; তাতে উপনীত হওয়ার জন্যে বর্ষপরম্পরায় এরফানী সাধনার প্রয়োজন। আর গভীর সাধনালব্ধ এ প্রক্রিয়ার (যা বাস্তব পরিচিতিসমূহের অন্তর্ভূক্ত) অনুমোদন, তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর নির্ভরশীল। অতএব, সাধনার প্রারম্ভেই এ বিষয়গুলোর সমাধান অনিবার্য। আর এ প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে অন্তর্জ্ঞানগত পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে। মূলতঃ প্রকৃত এরফান তার জন্যেই প্রযোজ্য, যিনি মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের পথে বিনীতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। আর এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রভুর পরিচিতি, তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ।

সিদ্ধান্ত :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহের সমাধান যারা খুজে থাকেন তাদের জন্যে একমাত্র উন্মুক্ত পথ হল বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির পথ। ফলে এর আলোকে বলতে হয়, দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টিই হল প্রকৃত বিশ্বদৃষ্টি।

তবে মনে রাখা উচিৎ যে, উল্লেখিত বিষয়সমূহের সমাধানকে বুদ্ধিবৃত্তিক পথে সীমাবদ্ধকরণ ও দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টিকেই একমাত্র বিশ্বদৃষ্টিরূপে পরিগণনের অর্থ এ নয় যে, সঠিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি লাভের জন্যে সকল দার্শনিক বিষয়েরই সমাধান করতে হবে। বরং কয়েকটি সরল দার্শনিক বিষয় যেগুলো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সেগুলোর সমাধানই খোদার অস্তিত্ব (যা বিশ্বদৃষ্টির মৌলিকতম বিষয় বলে পরিগণিত) প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। তবে এ ধরনের বিষয়সমূহের উপর পারদর্শিতা এবং সকল প্রকার সমস্যা ও দ্বিধার উত্তরদানের ক্ষমতা অর্জনের জন্যে অধিকতর দার্শনিক পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবার মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্যে অর্থপূর্ণ পরিচিতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতিতে সীমাবদ্ধকরণের অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য জ্ঞাত বিষয়সমূহ, এ বিষয়গুলোর সমাধানের ব্যাপারে ব্যবহৃত হবে না। বরং অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিক

যুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান , ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে প্রতিজ্ঞারূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমনঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়সমূহ ও গৌণ বিশ্বাসগত বিষয়সমূহের সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসগত পরিচিতিকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এগুলোকে কিতাব ও সুন্নতের (দ্বীনের বিশ্বস্ত উৎস) বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রমাণ করা যেতে পারে ।

পরিশেষে, সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শে উপনীত হওয়ার পর গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার পর্যায়সমূহ অতিক্রম করতঃ উদঘাটন ও পর্যবেক্ষণের (অন্তর্চক্ষু) স্তরে পৌঁছা যায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত এমন অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কে, মস্তিষ্কগত ভাবার্থসমূহের সাহায্য ব্যতীতই অবগত হওয়া সম্ভব।

৫ম পাঠ

খোদাপরিচিতি

ভূমিকা :

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, দ্বীনের মূলনীতিগুলো বিশ্ব- সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে রূপ পরিগ্রহ করে এবং ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি ও বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে মূল পার্থক্যও এ বিশ্বাসের (সৃষ্টিকর্তার অস্তিত) উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে।

অতএব, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্যে সর্বপথমেই যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয় এবং সর্বাগ্রেই যার সঠিক উত্তর জানতে হয় তা হল, খোদার অস্তিত্ব আছে কিনা? আর এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে (যা পূর্ববর্তী পাঠে আলোচিত হয়েছে) বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়- চাই তার ফল হোক ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক।

যদি এ অনুসন্ধানের ফল ইতিবাচক হয়, তবে খোদা সংক্রান্ত গৌণ বিষয়গুলোকে (একত্ব, ন্যায়বিচার এবং খোদার অন্যান্য বশিষ্ট্য) বিবেচনার পালা আসে। অনুরূপভাবে যদি অনুসন্ধানের ফল নেতিবাচক হয় তবে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন দ্বীন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গৌণ বিষয়গুলোকে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচিতি:

মহান আল্লাহ সম্পর্কে দু‘ধরনের পরিচিতির ধারণা পাওয়া যায় : একটি হল প্রত্যক্ষ পরিচিতি এবং অপরটি হল পরোক্ষ পরিচিতি ।

খোদার প্রত্যক্ষ পরিচিতি বলতে বুঝায়- মানুষ মস্তিষ্কগত ভাবার্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই একধরনের অন্তর্জ্ঞান ও আভ্যন্তরীণ অনুভূতির মাধ্যমে খোদার সাথে পরিচিত হয় ।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কেহ খোদা সম্পর্কে সচেতন অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে (যেরূপ অনেক উচ্চপর্যায়ের আরেফগণ দাবী করে থাকেন তবে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন যুক্তি- প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কিন্ত (যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) এধরনের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান সাধারণ কোন ব্যক্তির জন্যে [৭] কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন সে আত্মগঠন ও আধ্যাত্মিক সাধনার পর্যায়গুলো অতিক্রম করবে। তবে এর দুর্বল পর্যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকলেও যেহেতু অবস্থায় নেই, সেহেতু তা সচেতন বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়।

পরোক্ষ পরিচিতি বলতে বুঝায় যে, মানুষ সামগ্রিক ভাবার্থের (সৃষ্টিকর্তা, অমুখাপেক্ষী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞা) মাধ্যমে মহান আল্লাহ সম্পর্কে মস্তিষ্কগত পরিচিতি ও এধরনের 'অদৃশ্যগত' অর্থ অনুধাবন করে থাকে। আর এভাবে সে বিশ্বাস করে যে, এধরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান (যিনি এ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন)। অতঃপর, অন্যান্য পরোক্ষ পরিচিতি এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিশ্বদৃষ্টির সাথে সংগতিপূর্ণ একশ্রেণীর বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়ে থাকে।

যা সরাসরি বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যবেক্ষণ ও দার্শনিক যুক্তি- প্রামাণের মাধ্যমে অর্জিত হয় তা- ই হল পরোক্ষ পরিচিতি। কিন্ত যখন এধরণের পরিচিতি অর্জিত হয় কেবলমাত্র তখনই মানুষের জন্যে সাবগতিক প্রত্যক্ষ পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে।

ফিতরাতগত পরিচিতি :

ধর্মীয় নেতাগণ, আরেফগণ এবং মনীষীগণের অধিকাংশ বক্তব্যেই আমরা খুজে পাই যে, খোদা পরিচিতি ফিতরাতগত, অর্থাৎ মানুষ ফিতরাতগতভাবেই খোদাকে চিনে থাকে। সুতরাং উপরোক্ত বিবরণসমূহের সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়ার নিমিত্তে 'ফিতরাত ' শব্দটির ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করি।

ফিতরাত, একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হল ‘সৃষ্টি প্রকরণ ’ এবং কোন বিষয় ফিতরাত সংশ্লিষ্ট (ফিতরাতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত) বলে পরিগণিত হবে তখনই, যখন বিদ্যমান সৃষ্টি এদেরকে ধারণ করবে। সুতরাং এদের জন্যে তিনটি বিশেষত্ব বিবেচনা করা যেতে পারে :

১। প্রত্যেক শ্রেণীর ফিতরাগত বিশেষত্ব ঐ শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে পাওয়া যায়, যদিও তীব্রতা ও ক্ষীণতার দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মাত্রাভেদ পরিলক্ষিত হয় ।

২। ফিতরাতগত বিষয়সমূহ তাদের ইতিহাস পরিক্রমায় সর্বদা স্থির এবং এমন নয় যে, ইতিহাসের একাংশে সৃষ্টির ফিতরাত এক বিশেষত্ব বিশিষ্ট, আর অন্য অংশে অপর এক বিশেষত্ব বিশিষ্ট।[৮]

৩। ফিতরাতগত বিষয়সমূহ যে দৃষ্টিকোণে ফিতরাত সম্বন্ধীয় এবং সৃষ্টি প্রকৃতি কর্তৃক ধারণকৃত সে দৃষ্টিকোণে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই, যদিও এদের দৃঢ়ীকরণ ও দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মানুষের ফিতরাতগত বিশেষত্বকে দু‘শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে :

ক) ফিতরাতগত পরিচিতি, যার সাথে প্রত্যেক মানুষই কোন প্রকার শিক্ষা- দীক্ষা ব্যতিরেকেই পরিচিত হয়ে থাকে।

খ) ফিতরাতগত প্রবণতা ও চাহিদা যা সৃষ্টির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যেই বিদ্যমান।

অতএব, যদি এমন এক ধরনের খোদা পরিচিতি প্রত্যেকের মধ্যেই থেকে থাকে যে, প্রশিক্ষণও আয়ত্তকরণের প্রয়োজন নেই তবে, তাকে “ফিতরাতগত খোদা পরিচিতি ” নামকরণ করা যেতে পারে। আর যদি, খোদার প্রতি এবং খোদার উপাসনার প্রতি এক ধরনের প্রবণতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে, তবে তাকে ‘খোদার ফিতরাতগত উপাসনা ’ বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ পন্ডিতগণ দ্বীন এবং খোদার প্রতি মানুষের প্রবণতাকে মানুষের মানসিক বশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং একে ‘ধর্মানুভূতি ’ বা ‘ ধর্মানুরাগ ’ নামকরণ করেছেন। এখন আমরা সংযোজন করব যে, খোদা পরিচিতিও মানুষের ফিতরাতগত চাহিদারূপে জ্ঞাত হয়েছে। কিন্তু “খোদার ফিতরাতগত উপাসনা ’ যেমন সচেতন

প্রবণতা নয় তেমনি “ফিতরাতগত খোদা পরিচিতিও ” সচেতন পরিচিতি নয় যে, কোন সাধারণ ব্যক্তিকে খোদার শনাক্তকরণের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা থেকে অনির্ভরশীল করবে।

তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যেহেতু প্রত্যেকেই অন্ততঃ এক ক্ষীণ মাত্রায় ফিতরাতগত প্রত্যক্ষ পরিচিতির অধিকারী সেহেতু সামান্য একটু চিন্তা ও যুক্তির অবতারণাতেই খোদার অস্তিতকে স্বীকার করে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে অবচেতন স্তরের অন্তর্জ্ঞান ভিত্তিক পরিচিতিকে সুদৃঢ় করে সচেতন স্তরে পৌঁছাতে পারে ।

উপসংহারে বলা যায় : খোদা পরিচিতি ফিতরাতগত হওয়ার অর্থ হল এই যে, মানুষের অন্তর খোদার সাথে পরিচিত এবং তার আত্মার গভীরে খোদার সজ্ঞাত পরিচিতির জন্যে এক বিশেষ উৎস বিদ্যমান, যা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হতে সক্ষম। কিন্তু এ ফিতরাতগত উৎস সাধারণ ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে এমন অবস্থায় নেই যে, তাদেরকে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি থেকে অনির্ভরশীল করবে।

৬ষ্ঠ পাঠ

খোদা পরিচিতির সরল উপায়

খোদাকে চিনার উপায়সমূহ :

মহান প্রভুকে চিনার জন্যে একাধিক উপায় বিদ্যমান। দর্শনের বিভিন্ন বইয়ে, কালামশাস্ত্রে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন ভাষ্যে এবং ঐশী কিতাবসমূহেও এগুলো (উপায়) সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ যুক্তি- প্রমাণসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্পরিকভাবে বসাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন : কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহ প্রতিজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; যেখানে অন্য কোন ক্ষেত্রে খাঁটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি প্রজ্ঞাবান প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন; যেখানে অন্যান্যরা শুধুমাত্র এমন এক অস্তিত্বময়কে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যার অস্তিত্ব অপর কোন অস্তিত্বময়ের উপর নির্ভরশীল নয় (অর্থাৎ অবশ্যসম্ভাবী অস্তিত্ব) এবং তার বশিষ্ট্যসমূহকে চিহ্নিত করার জন্যে অপর এক শ্রেণীর যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা পরিচিতির যুক্তি- প্রমাণসমূহকে কোন এক নদী পারাপারের জন্যে বিদ্যমান বিভিন্ন পথের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এগুলোর কোন কোনটি কাঠের তরী সাধারণ পুল যা নদীর উপর দিয়ে চলে গিয়েছে এবং লঘু ভারবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি খুব সহজেই একে অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। আবার কোন কোনটি হল প্রস্তর নির্মিত সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘ পুলের মত যার অতিক্রান্ত পথের দর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী। কোন কোনটি আবার আঁকাবাঁকা, উঁচু- নীচু এবং সুদীর্ঘ টানেল বিশিষ্ট রেলপথের মত, যা গুরুভারের ট্রেনের জন্যে তরী করা হয়েছে।

যে সকল ব্যক্তি মুক্ত মস্তিষ্কের (خالی الذهن) অধিকারী, তারা অত্যন্ত সহজ উপায়েই আপন প্রভুকে চিনে তাঁর (প্রভুর) উপাসনায় নিয়োজিত হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ সন্দেহের গুরুভার

স্কন্ধে ধারণ করে, তবে তাকে প্রস্তর নির্মিত পুল অতিক্রম করতে হবে। আবার যদি কেউ সন্দেহ ও দ্বিধা- দ্বন্দ্বের বোঝা বহন করে চলে, তবে তাকে এমন কোন পথ নির্বাচন করতে হবে যা শত উঁচ- নীচু ও আঁকা- বাঁকা সত্বেও মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্মিত।

আমরা এখানে সর্বপথমে খোদা- পরিচিতির সরল পথের প্রতি ইঙ্গিত করব। অতঃপর কোন একটি মাধ্যম সম্পর্কে বর্ণনা করব। কিন্ত দর্শনের মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আঁকা- বাঁকা পথটি শুধুমাত্র তাদেরকেই অতিক্রম করতে হবে, যাদের মস্তিষ্ক অসংখ্য সন্দেহের দ্বারা সন্দিগ্ধ হয়ে আছে। অথবা তাদের মস্তিষ্ককে সন্দেহ মুক্তকরণের মাধ্যমে পশ্চাদ্ধাবন ও পথভ্রষ্টতার হাত থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করতে হবে ।

সরল উপায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

খোদা- পরিচিতির সরলপথের একাধিক বিশেষত্ব ও বশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো গুরুত্বপূর্ণ :

১। এ পথ কোন প্রকার জটিল ও কৌশলগত প্রতিজ্ঞার (مقدمة) উপর নির্ভরশীল নয় এবং সরলতম বক্তব্যসমূহই এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে । ফলে, যে কোন স্তরের ব্যক্তিবর্গের পক্ষেই অনুধাবনযোগ্য।

২। এ পথ প্রত্যক্ষভাবে প্রজ্ঞাবান ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে থাকে, যা অনেক দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রগত যুক্তি- পথের ব্যতিক্রম। ঐ সকল কালামশাস্ত্র ও দার্শনিক যুক্তিতে সর্বপ্রথমেই ‘অনিবার্য অস্তিত্ব ’ নামে এক অস্তিত্বময় বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তারপর তার জ্ঞান, শক্তি, প্রজ্ঞা, সৃজন ক্ষমতা, প্রতিপালকত্ব এবং অন্যান্য বশিষ্ট্যসমূহকে অপর কোন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা আবশ্যক।

৩। এ পথ, অন্য সকল কিছুর চেয়ে ফিতরাতকে জাগ্রত করা ও ফিতরাতগত জ্ঞানের অবহিতকরণের ব্যাপারে ভূমিকা রাখে। এ (ফিতরাতগত জ্ঞানের অবহিতকরণ) বিষয়গুলোর উপর চিন্তার ফলে এমন এক ইরফানী অবস্থা মানুষের দিকে হস্ত প্রসারিত করে যেন খোদার

হস্তকে বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে অবলোকন করে থাকে - সেই হস্ত যার সাথে তার ফিতরাত পরিচিত।

উপরোক্ত বশিষ্ট্যসমূহের কারণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং ঐশী ধর্মসমূহের প্রবক্তাগণ এ পথকে সাধারণ জনসমষ্টির জন্য নির্বাচন করেছেন এবং সকলকে এ পথ অতিক্রম করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন; আর অন্যান্য পদ্ধতিসমূহকে, হয় বিশেষ কোন ক্ষেত্রের জন্য একান্তভাবে বরাদ্দ করেছেন, অথবা নাস্তিক্য চিন্তাবিদ ও বস্তুবাদী দার্শনিকদের সাথে তর্ক- বিতর্কের সময় প্রয়োগ করেছেন।

পরিচিত নির্শনসমূহ :

খোদা পরিচিতির সরল পথ হল, এ বিশ্বে বিদ্যমান খোদার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং কোরানের ভাষায় "আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তাকরণ" । বিশ্ববক্ষান্ডের সকল বিষয়বস্ত্র এবং মানব অস্তিত্বে উপস্থিত বিষয় গুলো যেন পরিচিতির কাঙ্খিত নিদর্শন এবং মানব মানসের সূচক, সে অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পথ নির্দেশ করে, যে অস্তিত্ব সর্বদা সর্বস্থলে উপস্থিত।

পাঠকমন্ডলী, যে বইটি এখন আপনাদের হস্তে রয়েছে তাও তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনসমূহেরেই একটি। যদি তা- ই না হবে তবে কেন এ বইটি পড়ার সময় এর সচেতন ও অভিপ্রায়ী লেখক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারছেন? কখনো কি এটা সম্ভব বলে মনে করেছেন যে, এ বইটি এক শ্রেণীর বস্তুগত, উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ফলে অস্তিত্বে এসেছে এবং এর কোন অভিপ্রায়ী লেখক নেই? এটা ভাবা কি বোকামী নয় যে, কোন একটি ধাতব খণিতে বিস্ফোরণের ফলে ধাতব কণিকাগুলো বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং ঘটনাক্রমে পত্রপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত হয়ে লিখনের সৃষ্টি হয়েছে; অতঃপর অপর একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে সুশৃংখলিত ও বাঁধাইকৃত হয়ে একশত খণ্ডের একটি বিশ্বকোষের উৎপত্তি হয়েছে ?

কিন্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রহস্যময় ও পান্ডিত্যপূর্ণ এ মহাবিশ্বের উৎপত্তির ঘটনাকে নিছক দুঘটনা বলে মনে করা উপরোল্লিখিত বিশ্বকোষের উৎপত্তির ঘটনার চেয়ে সহস্রবার বোকামীর শামিল ।

হ্যাঁ, প্রতিটি পরিকল্পিত বিন্যাস ব্যবস্থাই তার পরিকল্পনাকারীর নিদর্শনস্বরূপ। আর এ ধরনের বিন্যাস ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বদা এমন এক সামগ্রিক শৃঙ্খলাই প্রকাশ করে যে, এক প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা একে অস্তিত্বে এনেছেন এবং সর্বাবসস্থায় তিনি এর পরিচালনায় নিয়োজিত।

ফুলগুলো যে পুষ্পকাননে ফুটেছে, আর মাটি কর্দমার মাঝে রঙ বেরঙ সাজে ও সুগন্ধি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থেকে ফলবৃক্ষ যে অঙ্কুরিত হচ্ছে এবং প্রতিবছর অজস্র সংখ্যক সুবর্ণ, সুগন্ধ ও সুস্বাদু ফল ধারণ করছে; তদ্রূপ নানা বর্ণ, নানা বিশেষত্ব ও নানারূপের অন্যান্য বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সকল কিছুই তাঁরই (খোদার) অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে থাকে ।

অনুরূপ, পুষ্পশাখায় বুলবুলি যে গান গেয়ে যাচ্ছে; ডিম থেকে বের হয়ে মুরগীছানা যে পৃথিবীতে বিচরন করছে; নবজাতক গোবৎস যে মাতৃস্তন চোষণ করছে; দুগ্ধ মাতৃস্তনে নবজাতকের- পানের জন্যে যে সঞ্চিত হচ্ছে ইত্যাদি সর্বদা এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বেরই প্রমাণ বহণ করে থাকে।

সত্যিই, কি এক আশ্চর্য যোগসূত্র ও বিস্ময়কর অভিসন্ধি রয়েছে যুগপৎ শিশু জন্ম ও মাতৃস্তনে–দুগ্ধ সঞ্চারের মধ্যে।

মৎসসমূহ যে প্রতিবছর ডিম পাড়ার জন্যে শত শত কিলোমিটার পথ প্রথমবারের মত অতিক্রম করে; সামুদ্রিক প্রাণীসমূহ যে অসংখ্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের মাঝে আপন নীড়কে চিনে নেয়, এমনকি একবারের জন্যেও ভুলবশতঃ অপরের বাসায় প্রবেশ করে না, মৌমাছি যে, প্রত্যহ প্রাতে মৌচাক থেকে বের হয়ে যায় আর সুগন্ধযুক্ত ফুলে- ফলে বিচরণ করার জন্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর গোধুলী লগ্নে যে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে ইত্যাদি তাঁরই নিদর্শন ।

বিস্ময়ের ব্যপার হল, যেমনি মৌমাছিরা তেমনি দুগ্ধবতী গাভী ও ছাগলরা প্রত্যেকেই সর্বদা নিজের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক মধু ও দুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে, যাতে করে মানুষ এ সুস্বা দু উপাদেয় থেকে উপকৃত হতে পারে!

কিন্তু পরিহাস, অকৃতজ্ঞ মানুষ নিজ বভবের পরিচিত মালিককে অপরিচিত বলে মনে করে এবং তাঁর সম্পর্কে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়!

স্বয়ং এ মানবদেহেও বিস্ময়কর ও সুনিপূন কীর্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট অঙ্গের মাধ্যমে শরীরীয় সংগঠন; সংশ্লিষ্ট উপাঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গ সংগঠন; সংশ্লিষ্ট মিলিয়ন মিলিয়ন বিশেষ জীবন্ত কোষের মাধ্যমে উপাঙ্গ সংগঠন; প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণের সমন্বয়ে কোষ সংগঠন; শরীরের যথাস্থানে অঙ্গ- প্রত্যঙ্গসমূহের সংস্থাপন; অঙ্গ- প্রত্যঙ্গসমূহের অভিপ্রেত কর্মতৎপরতা। যেমন : ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ ও লোহিত রক্তকণিকার মাধ্যমে তা দেহের বিভিন্ন কোষে সঞ্চালন, যকৃতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্লুকোজ উৎপাদন, নূতন কোষ সমূহের সরবরাহের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ অঙ্গ- প্রত্যঙ্গসমূহের নিরাময় সাধন; শ্বেতকোষের মাধ্যমে আক্রমণকারী ব্যাক্টেরিয়া ও রোগজীবাণুকে প্রতিহতকরণ; একাধিক গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ, যেগুলো প্রাণীর শরীরের বিভিন্ন অংশের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ইত্যাদি সকল কিছু তাঁরই অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে থাকে ।

এই যে বিস্ময়কর বিন্যাস ব্যবস্থা যার সঠিক রহস্য উদঘাটনে শতসহস্র সংখ্যক বিজ্ঞানী কয়েক দশকাব্দী পথ অতিক্রম করার পরও ব্যর্থ হয়েছে - কার মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়েছে ?

প্রতিটি কোষই একটি ক্ষুদ্র ব্যবস্থার সংগঠনে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং এক শ্রেণীর কোষসমষ্টি উপাঙ্গসমূহের সংগঠনে অংশ নেয়, যা অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ব্যবস্থার সংগঠনে অংশ নেয়; অনুরূপ এ ধরনের একাধিক জটিল ব্যবস্থার সমন্বয়ে অভিপ্রেত শারীরিক সামগ্রিক ব্যবস্থারূপ পরিগ্রহ করে। কিন্ত এখানেই এ ঘটনার শেষ নয়, বরং অগণিত প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ অস্তিত্বের সমন্বয়ে বিশ্ব পকৃতি নামে অশুল- প্রান্তহীন এক বৃহত্তম ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, যা একক পান্ডিত্যপূর্ণ পরিকল্পনার ছায়াতলে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)

তিনিই; অতএব কিভাবে তোমরা সত্য হতে বিচ্যুত হও (সূরা আনআম- ৯৫)!

এটা নিশ্চিত যে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তার লাভ করবে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় ও নীতি যতই আবিস্কৃত হবে, ততই সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হতে

থাকবে। তবে প্রকৃতির এ সরল সৃষ্টিসমূহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করাই নিষ্কলুষ ও নির্মল হৃদয়ের জন্যে যথেষ্ট।

৭ম পাঠ

অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণকরণ

ভূমিকাঃ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, ঐশী দার্শনিকগণ এবং কালামশাস্ত্র বিদগণ খোদার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন, যা দর্শন ও কালামশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ঐগুলোর মধ্যে যে প্রমাণটি অপেক্ষাকৃত কম ভূমিকার প্রয়োজন এবং সহজবোধ্য সেটিকে নির্বাচন করতঃ তার ব্যাখ্যা প্রদান করব। তবে একথা স্বরণযোগ্য যে, এ প্রমাণটি খোদার অস্তিত্বকে শুধুমাত্র "অনিবার্য অস্তিত্ব" শিরোনামে প্রমাণ করে - অর্থাৎ যাঁর অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয় এবং কোন অস্তিত্ব প্রদানকারীর উপর নির্ভরশীল নয়। অনিবার্য অস্তিত্বকে প্রমাণ করার পর তার 'হ্যাঁ- বোধক' বশিষ্ট্য (صفت الثبوتية) ও 'না- বোধক' বশিষ্ট্যকে (صفت السلبية) অপর এক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। 'হ্যাঁ- বোধক' বশিষ্ট্যের উদাহরণ হল জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি এবং 'না- বোধক' বশিষ্টের উদাহরণ হল অশরীরীয় হওয়া, নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ না হওয়া।

প্রমাণের বিষয়বস্তু:

অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহ, (বুদ্ধিবৃত্তিক মতে) হয় অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং কোন অস্তিত্বশীল বিষয়ই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এ দু'ধারণার বর্হির্ভূত হতে পারে না। সকল অস্তিত্বশীল বিষয়ই সম্ভাব্য অস্তিত্ব হতে পারে না। কেননা, সম্ভাব্য অস্তিত্ব কারণের মুখাপেক্ষী। সুতরাং যদি সমস্ত কারণসমূহ সম্ভাব্য অস্তিত্ব হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেকটি কারণকেই অপর এক কারণের মুখাপেক্ষী হতে হবে। ফলে কখনোই কোন অস্তিত্বশীল বিষয় বাস্তব রূপ লাভ করবে না। অন্যভাবে বলা যায়: কারণের ধারাবাহিকতা অসম্ভব। অতএব অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহের

কারণসমূহ ধারাবাহিকভাবে এমন এক অস্তিত্বশীল বিষয়ে উপনীত হয়, যা স্বয়ং অপর অস্তিশীল বিষয়ের ফলশ্রুতি নয় অর্থাৎ যা হবে অনিবার্য অস্তিত্ব। এ প্রমাণটি খোদার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্যে দর্শনের একটি সরলমত প্রমাণ, যা কয়েকটি খাঁটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিজ্ঞা দ্বারা রূপ লাভ করেছে এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয় । তবে যেহেতু এ প্রমাণটিতে দার্শনিক পরিভাষা ও ভাবার্থসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু যে সকল প্রতিজ্ঞা ও পরিভাষার মাধ্যমে, উল্লেখিত প্রমাণটি রূপপরিগ্রহ করেছে তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা অনিবার্য ।

সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতা:

প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই (যতই সরল হোক না কেন) কমপক্ষে দুটি মৌলিক ভাবার্থ যথা : উদ্দেশ্য(موضوع) ও বিধেয় (محمول) নিয়ে গঠিত হয়। যেমন : সূর্য্য উজ্জল এ প্রতিজ্ঞাটিতে “সূর্য ” হল উদ্দেশ্য আর “উজ্জ্বল ” হল বিধেয় এবং প্রতিজ্ঞাটি সূর্যের জন্যে উজ্জ্বলতাকে প্রতিপাদন করে থাকে।

উদ্দেশ্যের জন্যে বিধেয়ের প্রতিপাদন তিনটি অবস্থার ব্যতিক্রম হতে পারে না। হয় অসম্ভব যেমন : “৪ অপেক্ষা ৩ বড়, ” অথবা অনিবার্য যেমন : “৪ এর অর্ধেক হল ২ ” নতুবা অসম্ভব বা অনিবার্য এ দুয়ের কোনটি নয় যেমন : সূর্য আমাদের মাথার উপর অবস্থান করছে ।

যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় উপরোক্ত প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার সম্পর্ককে নিষিদ্ধ (امتناع), দ্বিতীয়ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার সম্পর্ককে “অনিবার্য (ضرورت) বা আবশ্যকীয় (وجوب) তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞারসম্পর্ককে “সম্ভাবনা ”(امکان) (বিশেষ অর্থে) গুণসম্বলিত বলা হয়ে থাকে ।

দর্শনে ‘অস্তিত্বশীল বিষয় ’ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যা কিছু নিষিদ্ধ ও অসম্ভব তা কখনোই বাস্তব রূপ লাভ করে না (তাই এ বিষয়ের আলোচনা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয় না)। ফলে

দর্শনশাস্ত্র, অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহকে বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে অনিবার্য অস্তিত্ব ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব এ দু ' ভাগে বিভক্ত করেছে।

অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝায়, যে অস্তিত্বশীল বিষয় নিজ থেকেই অস্তিত্বশীল এবং তার এ¡ অস্তিত্বের জন্যে অপর কোন অস্তিত্বশীল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। ফলে স্বভাবতঃই এ ধরনের অস্তিত্ব অনাদি ও অনন্ত হবে। কারণ, কোন এক সময় কোন কিছুর অনুপস্থিতির অর্থ হল তার অস্তিত্ব নিজ থেকে নয় এবং অস্তিত্বে আসার জন্যে অপর এমন কোন অস্তিত্বশীলের উপর নির্ভর করতে হয় যে তার উপস্থিতি হল (এর উপস্থিতির জন্যে) শর্ত ও কারণ স্বরূপ; আর তার অনুপস্থিতিতে এর অস্তিত্ব থাকে না।

সম্ভাব্য অস্তিত্ব হল তা, যা নিজ থেকে অস্তিত্বশীল নয় এবং যার অস্তিত্বশীলতার জন্যে অপর কোন অস্তিত্বের উপর নির্ভর করতে হয় ।

অস্তিত্বের এ শ্রেণীবিভাগ বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং সংগত কারণেই তা নিষিদ্ধ অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তবে বাস্তব অস্তিত্বসমূহ এ দু'বিভাগের (অনিবার্য অস্তিত্ব ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব)কোনটির অন্তর্ভূক্ত সে সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা নেই। অন্য কথায়, এ ব্যাপারটিকে তিন ভাবে অনুধাবণ করা যেতে পারে। যথা :

প্রথমতঃ সকল অস্তিত্বই হল অনিবার্য অস্তিত্ব।

দ্বিতীয়তঃ সকল অস্তিত্বই হল সম্ভাব্য অস্তিত্ব।

তৃতীয়তঃ কোন কোনটি হল অনিবার্য অস্তিত্ব আবার কোন কোনটি হল সম্ভাব্য অস্তিত্ব।

প্রথম ও তৃতীয় ধারণায় 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' বিদ্যমান। অতএব এ ধারণাটিকেই (দ্বিতীয়) আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে স্থান দিতে হবে যে, 'সকল অস্তিত্বই কি সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়া সম্ভব, না কি অসম্ভব '? আর এ ধারণাটির অপনোদনের মাধ্যমেই 'অনিবার্য অস্তিত্বের ' ধারণা চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যদিও তার একত্ব এবং অন্যান্য গুণকে প্রতিপাদনের জন্যে অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করা আবশ্যক ।

অতএব, দ্বিতীয় ধারণাটিকে পরিত্যাগ করার জন্যে অপর একটি প্রতিজ্ঞাকে উল্লেখিত প্রমাণের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আর তা হল এই যে, 'সকল অস্তিত্বই সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়া অসম্ভব ' । তবে এ প্রতিজ্ঞাটি স্বতঃসিদ্ধ নয়। এ কারণে একে নিম্নরূপে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক :

সম্ভাব্য অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভরশীল এবং কারণের অসীম ধারাবাহিকতা অসম্ভব। অতএব কারণসমূহ তাদের ধারাবাহিকতায় এমন এক অস্তিত্বে গিয়ে পৌঁছতে হবে যা কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। আর তা- ই হল 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' । সুতরাং সকল অস্তিত্বই সম্ভাব্য অস্তিত্ব নয়। আর এখান থেকেই অপর এক দার্শনিক বিষয়ের সূত্রপাত ঘটে, যার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

কার্য ও কারণ:

যদি কোন অস্তিত্বশীল বিষয় অপর কোন অস্তিত্বশীল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয় এবং তার অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে দর্শনের পরিভাষায় নির্ভরশীল অস্তিত্বকে কার্য (معلول) এবং অপরটিকে কারণ (علت) নামকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কারণ নিরঙ্কুশভাবে অনির্ভরশীল নাও হতে পারে, বরং 'কারণ' নিজেও নির্ভরশীল ও অন্য কোন অস্তিত্বশীলের কার্য, হতে পারে। আর যদি কোন কারণের (অপর কোন কারণের উপর) কোন প্রকার নির্ভরশীলতা ও নির্ভরতা না থাকে তবে ঐ কারণকে 'নিরঙ্কুশ কারণ ' এবং 'সম্পূর্ণরূপে অনির্ভরশীল কারণ ' বলা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত আমরা কারণ ও কার্যের দার্শনিক পরিভাষা এবং তাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এখন আমাদেরকে এ প্রতিজ্ঞাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে যে, 'সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল '।

'সম্ভাব্য অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না ' এ বাক্যের আলোকে বলা যায় উহার অস্তিত্ব, অপর কোন অস্তিত্বশীল বিষয় বা বিষয়সমূহের বাস্তব রূপ পরিগ্রহণের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। কারণ এ উক্তিটি (قضية) স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রত্যেক বিধেয়ই (محمول) যা

উদ্দেশ্যের (موضوع)জন্যে বিবেচনায় নেয়া হয় তা হয় নিজ থেকেই বিদ্যমান (সত্তাগতভাবে) অথবা অন্য কোনভাবে (পরগতভাবে) বিদ্যমান। যেমন : কোন বস্তু হয় নিজ থেকেই আলোকিত হয়ে থাকে অথবা অন্য কোন কিছুর আলোর মাধ্যমে আলোকিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বস্তুই হয় নিজে থেকেই তলাক্ত অথবা অন্য কোন কিছুর (তলের) মাধ্যমে তলাক্ত হয়ে থাকে । এটা অসম্ভব যে, কোন কিছু না স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোকিত বা তলাক্ত হবে, না অন্য কিছুর মাধ্যমে যা সংশ্লিষ্ট বশিষ্ট্য বা গুণসম্বলিত; আর এমতাবস্থায় তা তলাক্ত বা আলোকিত, এ গুণের অধিকারী হবে ?

অতএব, কোন উদ্দেশ্যের (موضوع) জন্যে অস্তিত্বের প্রতিপাদন হয়, সত্তাগতভাবে অথবা পরগত ভাবে হয়ে থাকে এবং যখন সত্তাগতভাবে না হয়, তখন পরগতভাবে হওয়া অনিবার্য। ফলে যে সকল সম্ভাব্য অস্তিত্ব স্বয়ংক্রীয়ভাবে অস্তিত্বশীল গুণাবলীতে ভূষিত না হয়, সে সকল অস্তিত্ব অপর কোন অস্তিত্বশীলের সহায়তায় অস্তিত্বে আসে এবং তার কার্য রূপে (معلول) পরিগণিত হয়।

কিন্তু অনেকের মতে কার্যকারণ বিধির (Causality) প্রকৃত অর্থ হল সকল অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল,আর এর ভিত্তিতে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকেন যে,খোদার জন্যেও কোন কারণকে বিবেচনা করা আবশ্যক তবে তারা এ কথাকে বিস্মৃত হয়েছেন যে,কার্যকারণ বিধির উদ্দেশ্য(موضوع) নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নয় বরং এর উদ্দেশ্য (موضوع) হল ‘সম্ভাব্য অস্তিত্ব ’ ও কার্য। অর্থাৎ সকল নির্ভরশীল বা পরগত অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল,না সকল অস্তিত্বই।

কারণের অসীম ধারাবাহিকতা অসম্ভব :

এ প্রমাণের জন্যে ব্যবহৃত সর্বশেষ প্রতিজ্ঞাটি হল, কারণের ধারাবাহিকতা এমন এক অস্তিত্বে গিয়ে শেষ হতে বাধ্য যে, ঐ অস্তিত্ব অপর কোন কারণের কার্য (معلول) নয়। অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে কারণের ধারাবাহিকতা অসীম পর্যন্ত অসম্ভব। আর এ প্রক্রিয়ায় সর্বপথম কারণরূপে

অনিবার্য অস্তিত্ব অর্থাৎ যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্বশীল এবং অপর কোন অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, তা প্রতিপাদিত হয়ে থাকে ।

দর্শন, কারণের ধারাবাহিকতাকে রহিতকরণের জন্যে একাধিক যুক্তির অবতারণা করেছে। তবে সত্যিকার অর্থে কারণের অসীম ধারাবাহিকতার অসারতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ এবং কিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ 'কার্যের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভরশীল এবং উক্ত কারণের শর্তাধীন ' যদি এ নিয়মতান্ত্রিকতা সার্বজনীন বলে মনে করা হয়, তবে কখনোই কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করবে না । কারণ, নির্ভরশীল অস্তিত্বের সমষ্টি, অপর কোন অস্তিত্ব অর্থাৎ যার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তা ব্যতীত অস্তিত্বে আসার ধারণা বিবেক সম্পন্ন হতে পারে না।

মনে করা যাক, এক দল দৌড় প্রতিযোগী দৌড় শুরু করার জন্যে প্রারম্ভিক রেখায় প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্ত প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি তার পরবর্তী ব্যক্তি শুরু না করে তবে সেও শুরু করবে না। যদি তাদের এ সিদ্ধান্ত সার্বজনীন হয়, তবে কখনোই কোন প্রান্ত থেকেই দৌড় প্রতিযোগিতা বাস্তবায়িত হবে না ।

অনুরূপ যদি প্রতিটি অস্তিত্বই অপর অস্তিত্বের শর্তাধীন হয় তবে কখনোই কোন অস্তিত্ব বাস্তবরূপ লাভ করবে না। বাস্তব অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হল, অনির্ভরশীল ও শর্তহীন অস্তিত্বেরই প্রমাণবাহক।

যুক্তির অবতারণা :

এখন উপরোল্লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহের (مقدمات) আলোকে যুক্তিটিকে উপস্থাপন করব :

অস্তিত্বশীল বলে পরিগণিত প্রতিটি বিষয়ই নিম্নলিখিত দু'অবস্থার বহিঃর্ভূত হতে পারে না : হয় অস্তিত্ব তার জন্যে অনিবার্য এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্বশীল অর্থাৎ 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' অথবা অস্তিত্ব তার জন্যে অনিবার্য নয় এবং অপর কোন অস্তিত্বের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে; অর্থাৎ সম্ভাব্য অস্তিত্ব। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কোন কিছুর অস্তিত্বলাভ অসম্ভব হয়ে থাকে, তবে

কখনোই তা অস্তিত্ব লাভ করবে না এবং কোন অবস্থাতেই তা অস্তিত্বশীল বলে পরিগণিত হতে পারে না।

অতএব, সকল অস্তিত্বশীল বিষয়ই (موجود) হয়, 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' হবে অথবা সম্ভাব্য 'অস্তিত্ব ' হবে।

'সম্ভাব্য অস্তিত্বের ' ভাবার্থের প্রতি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ অর্থের যথার্থভাবের অধিকারী সকল কিছুই হল কার্য (معلول) যেগুলো কারণের উপর নির্ভরশীল। কারণ কোন অস্তিত্বশীল বিষয় যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্বশীল না হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই অপর কোন অস্তিত্বশীলের মাধ্যমে অস্বিত্বে এসেছে। যেমনঃ যদি কোন বশিষ্ট্য সত্তাগতভাবে (بالذات) না হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই পরগত ভাবে (بالغير) হবে। আর কার্যকারণ বিধির তাৎপর্যও হল তা- ই যে, প্রত্যেক ' নির্ভরশীল অস্তিত্ব ' বা 'সম্ভাব্য অস্তিত্বই ' কারণের উপর নির্ভরশীল, না সকল অস্তিত্বই; যাতে বলার অবকাশ থাকবে যে খোদাও কারণের উপর নির্ভরশীল অথবা কারণবিহীন খোদার প্রতি বিশ্বাস সস্থাপন হল কার্যকারণ বিধির পরিপন্থী।

অপরপক্ষে, যদি সকল অস্তিত্বশীলই সম্ভাব্য হয় এবং কারণের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে কখনোই কোন অস্তিত্ব বাস্তবরূপ লাভ করবে না। আর এ ধরনের ধারণার দৃষ্টান্ত ঐরূপ যে, কোন দলের সকল সদস্যই অপর সদস্যের শুরু করণের শর্তাধীন এবং ঐ অবস্থায় কোন কিছুই ঘটবে না।

অতএব, বাস্তব অস্তিত্বসমূহের উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে, এক 'অনিবার্য অস্তিত্বের' (واجب الوجود) অস্তিত্ব বিদ্যমান।

৮ম পাঠ

আল্লাহর গুণসমূহ

ভূমিকা :

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ দার্শনিক যুক্তির সারবত্তা হল 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' নামক এক অস্তিত্বশীলকে প্রতিপাদন করা। আর অপর এক শ্রেণীর যুক্তির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তা ' হ্যাঁ- বোধক ' ও 'না- বোধক ' গুণগুলো প্রমাণিত হয়ে থাকে। এরূপে মহান আল্লাহকে তাঁর বিশেষগুণসমূহ অর্থাৎ যেগুলো তাঁকে সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র করে সেগুলোসহ শনাক্ত করা হয়ে থাকে। অন্যথায় শুধুমাত্র 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' হওয়াই তাঁর (আল্লাহর) পরিচিতির জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, পদার্থ অথবা শক্তির মত বিষয়গুলোও অনিবার্য অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত হতেপারে। আর এ কারণে একদিকে যেমনি, প্রভুর 'না- বোধক ' গুণগুলোকে প্রমাণ করতে হবে যাতে বোধগম্য হয় যে 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' বস্তুর জন্যে নিদিষ্ট গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে পবিত্র এবং কোন সৃষ্টির সদৃশ হতে পারে না; তেমনি অপর দিকে তাঁর 'হ্যাঁ- বোধক ' গুণগুলোকে ও প্রমাণ করতে হবে, যাতে উপাসনার জন্যে তাঁর উপযুক্ততা প্রতিভাত হয় এবং অন্যান্য বিশ্বাস যেমন : নবুওয়াত, কিয়ামত ও এদের শাখাসমূহকে প্রমাণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

পূর্ববর্তী যুক্তিগুলো থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' কারণের উপর নির্ভরশীল নয় এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহের জন্যই 'কারণ ' প্রয়োজন। অর্থাৎ অনিবার্য অস্তিত্বের দু'টি গুণ প্রতিষ্ঠিত হল : একটি হল, অপর যে কোন অস্তিত্বশীলের উপর তাঁর অনির্ভরশীলতা। কেননা যদি অপর কোন অস্তিত্বশীলের উপর ন্যূনমত নির্ভরশীলতাও থাকে, তবে ঐ অস্তিত্বশীল তাঁর কারণ রূপে পরিগণিত হবে। যেহেতু আমরা জেনেছি যে, কারণের অর্থই (দর্শনের পরিভাষায়) হল, অপর কোন অস্তিত্বশীল তার উপর নির্ভরশীল হবে। আর অপর প্রতিষ্ঠিত গুণটি

হল, সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বই, তার (অনিবার্য অস্তিত্ব) কার্য (معلول) এবং তার উপর নির্ভরশীল এবং তিনিই হলেন তাদের সৃষ্টির জন্যে সর্বপথম কারণ ।

এখন, উপরোল্লিখিত দু'উপসংহার থেকে তাদের প্রত্যেকের অবিয়োজ্য বিষয়সমূহকে বর্ণনা করব এবং 'অনিবার্য অস্তিত্বের ' 'হ্যাঁ- বোধক ' ও 'না- বোধক ' গুণসমূহকে প্রতিপাদন করব। তবে তাদের (হ্যাঁ- বোধক ও না- বোধক গুণ) প্রতিটির জন্যে দর্শন ও কালামশাস্ত্রে একাধিক প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্ত আমরা সহজে আয়ত্তকরণের নিয়মাধীন ও পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুসমূহের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে ঐ সকল যুক্তিকেই নির্বাচন করব যেগুলো পূর্বোল্লিখিত যুক্তিসমূহের সাথে তাদের সম্পর্ককে সংরক্ষণ করবে।

আল্লাহর অনাদি ও অনন্ত হওয়া :

যদি কোন অস্তিত্বশীল অপর কোন অস্তিত্বশীলের (কারণ) কার্য (معلول) ও ঐ অস্তিত্বশীলের উপর র্নিভরশীল হয় তবে তার অস্তিত্ব ঐ অস্তিত্বশীলাধীন হবে এবং ঐ কারণের অনুপস্থিতিতে তা অস্তিত্বে আসতে পারবে না । অর্থাৎ কোন এক সময় কোন এক অস্তিত্বশীলের অস্তিত্বহীনতা তার¡ নির্ভরশীলতা ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়ারই প্রমাণবহ। যেহেতু অনিবার্য অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিদ্যমান এবং কোন অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল নয় সেহেতু সর্বদাই বিরাজমান থাকবে।

এ প্রক্রিয়ায় অনিবার্য অস্তিত্বের জন্যে অপর দু'টি গুণ প্রমাণিত হল। একটি হল 'অনাদি ' অর্থাৎ ইতিপূর্বে কখনোই অস্তিত্বহীন ছিল না এবং অপরটি হল 'অনন্ত' অর্থাৎ ভবিষ্যতেও কখনো বিলুপ্ত হবেনা। কখনো কখনো এ দু'টি গুণকে সম্মিলিত ভাবে 'চিরন্তনত্ব ' (سرمدی) বলা হয়ে থাকে।

অতএব, যে অস্তিত্বশীলের অস্তিত্বহীনতার পূর্বদৃষ্টান্ত অথবা বিলুপ্তির সম্ভাবনা থাকবে, সে অস্তিত্বশীল 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' হবে না। সুতরাং বস্তুগত বিষয়ের 'অনিবার্য অস্তিত্ব ' হওয়ার ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হল।

না -বোধক গুণ:

অনিবার্য অস্তিত্বের অপর একটি অবিয়োজ্য বিষয় হল অবিভাজ্যতা (بساطة) অর্থাৎ যৌগিক বা অংশসমূহের সমন্বয় না হওয়া। কারণ, সকল যৌগই এর অংশগুলির উপর নির্ভরশীল। আর অনিবার্য অস্তিত্ব সকল প্রকার নির্ভরশীলতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত ।

যদি মনে করা হয় যে, 'অনিবার্য অস্তিত্বের ' অংশগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অস্তিত্বশীল নয়, যেন একটি কল্পিত সরলরেখার দু'টি অংশ, তবে এ ধরনের ধারণাও পরিত্যাজ্য। কারণ যদি কোন কিছু অংশে বিভক্ত হওয়ার সামর্থ্য রাখে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তা বিভাজ্য হবে, যদিও বাস্তবে তার প্রকাশনা- ও ঘটে থাকে। আর বিভাজ্যতার সম্ভাবনা মানে হল বিলুপ্তির সম্ভাবনা। যেমন : যদি এক মিটার রেখা, দুটি অর্ধমিটারে বিভক্ত হয়, তবে আর 'এক মিটার রেখার ' অস্তিত্ব থাকবে না। অপর দিকে আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি যে, অনিবার্য অস্তিত্বের বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

আবার যেহেতু তাৎক্ষণিক (بالفعل) ও সামর্থ্যগতভাবে (بالقوة) এশাধিক অংশের সমন্বয় হল বস্তুর বিশেষত্ব, সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তুগত অস্তিত্বই অনিবার্য অস্তিত্ব হতে পারে না। অর্থাৎ খোদার অবস্তুগত হওয়া (تجرد) প্রমাণিত হল। অনুরূপ স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ (বাহ্যিক) চোখের মাধ্যমে দর্শনযোগ্য নন এবং অপর কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও অনুধাবনযোগ্য নন। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা হল বস্তু ও বস্তুগত বিশেষত্ব।

অপরদিকে বস্তুগত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে বস্তু ও অন্যান্য বস্তুগত বিশেষত্ব যেমন : নিদিষ্ট স্থান ও কালও অনিবার্য অস্তিত্ব ' থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ স্থান এমন কিছুর¡ জন্যেই ভাবা যায় যা আয়তন ও বিস্তার বিশিষ্ট হয়। অনুরূপ নির্দিষ্ট কালবিশিষ্ট সকল কিছুই আয়ুষ্কালের বস্তারের দৃষ্টিতে বিভাজনযোগ্য। আর এটাও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং সামর্থ্যগতভাবে (بالقوة) অংশের সমন্বয়রূপে পরিগণিত। অতএব মহান আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ও কালকে কল্পনা করা যায় না এবং নির্দিষ্ট স্থান ও কালবিশিষ্ট কোন অস্তিত্বই অনিবার্য অস্তিত্ব হতে পারে না। সর্বশেষে, অনিবার্য অস্তিত্ব থেকে নির্দিষ্ট কালের অস্বীকৃতির মাধ্যমে

গতি, বিবর্তন এবং বিকাশও তাঁর থেকে নিষিদ্ধ হয়। কারণ কোন গতি ও পরিবর্তনই কালাতিক্রম ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ।

অতএব যারা আল্লাহর জন্যে ‘আরশ ’ নামক নির্দিষ্ট স্থানের কথা বলে থাকেন অথবা আসমান থেকে অধঃগমন ও স্থানান্তরিত হন বলে মনে করেন অথবা চর্মচক্ষুর মাধ্যমে দর্শনযোগ্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন; অথবা তাঁকে বিবর্তন ও বিকাশমান বলে গণনা করে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে সঠিকরূপে চিনতে পারেননি ।[৯]

সর্বোপরি যে কোন প্রকারের ভাবার্থ যা এক ধরনের ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার প্রমাণবহ, তা মহান আল্লাহর জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে এবং আল্লাহর ‘না- বোধক ’ গুণ বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে ।

অস্তিতদানকারী কারণ:

পূর্ববর্তী যুক্তিসমূহ থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, ‘অনিবার্য অস্তিত্বই ’ হল সকল ‘সম্ভাব্য অস্তিত্বের ’ কারণ। এখন আমরা এ উপসংহারের অবিচ্ছেদ্য বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করব। তবে প্রথমেই কারণের প্রকরণগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব। অতঃপর প্রভুর কারণত্বের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

কারণের সাধারণ অর্থ, সকল অস্তিত্বশীল অর্থাৎ যেগুলোর উপর অপর কোন অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এমনকি শর্তসমূহ এবং সহায়কসমূহকেও সমন্বিত করে থাকে। সুতরাং মহান আল্লাহর জন্যে কারণ না থাকার অর্থ হল, অন্য কোন অস্তিত্বের উপর কোন প্রকারের নির্ভরশীলতা না থাকা। এমনকি কোন প্রকারের শর্ত ও সহায়কও তাঁর জন্যে কল্পনা করা যায় না।

কিন্ত সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর কারণ হওয়ার অর্থ হল, অস্তিত্বদাতা অর্থে, যা কতৃকারণের

(علت فعلی)এক বিশেষ শাখা। এর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে বিভিন্ন প্রকার কারণের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যার দায়িত্ব দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রদান করব।

আমরা জানি যে, বৃক্ষ উদগত হওয়ার জন্যে বীজ, উপযুক্ত মাটি এবং আবহাওয়ার প্রয়োজন। অনুরূপ একটি প্রাকৃতিক বা মানবীয় কার্যনির্বাহীরও প্রয়োজন, যে বীজটিকে মাটিতে বপন করবে এবং তাতে পানি সরবরাহ করবে। এদের প্রত্যেকেই উল্লেখিত কারণের সংজ্ঞানুসারে বৃক্ষের উদগতির কারণ।

এ বিভিন্ন প্রকারের কারণসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন : যে সকল কারণ কার্যের বিদ্যমানতার জন্যে সর্বদাই অপরিহার্য সেগুলোকে প্রকৃত কারণ (علل الحقيقية) বলা হয়ে থাকে এবং যে সকল কারণ কার্যের বিদ্যমানতার জন্যে অপরিহার্য নয় (যেমন : কৃষক ফসলের জন্যে) সেগুলোকে সহায়ক কারণ (علل الاعدادی অথবা معدات) বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ প্রতিস্থাপনযোগ্য কারণকে প্রতিস্থাপিত কারণ (علل البدلی) এবং অন্যান্য কারণসমূহকে স্বতন্ত্র কারণ(علل الانحصاری) বলা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া অপর একশ্রেণীর কারণ আছে, যেগুলো উপরোক্ত বৃক্ষের উদগতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা থেকে স্বতন্ত্র এবং এদের দৃষ্টান্তকে আত্মা (النفس) বিষয়ক ক্ষেত্রে বা কোন কোন আত্মিক বিষয়ে পরিলক্ষণ করা যেতে পারে। উদাহরণতঃ যখন মানুষ তার মস্তিষ্কে একটি চিত্র গঠন করে অথবা কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন, মস্তিষ্ক পসূত চিত্র ও ইচ্ছা নামক এমন একধরনের আত্মিক ও মানস সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করে, যাদের অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভরশীল এবং দৃষ্টিকোণ থেকে ঐগুলো আত্মার কার্য (معلول) বলে পরিগণিত। কিন্ত এ ধরনের কার্য (معلول) এমন যে, কখনই তাদের কারণ থেকে স্বাধীনরূপে বিরাজ করে না এবং উক্ত কারণ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে

অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনা। এছাড়া মস্তিষ্কে অংকিত ছবি অথবা ইচ্ছার ক্ষেত্রে আত্মার ভূমিকা এমন সকল শর্তের অধীন যে, তার ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ।

অতএব, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতে অনিবার্য অস্তিত্বের ভূমিকা আত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রে আত্মার ভূমিকা অপেক্ষাও বৃহত্তর ও পূর্ণতর এবং অতুলনীয়। কারণ, তিনি কোন প্রকারের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করে থাকেন এবং ঐ সৃষ্টি সমস্ত সত্তা নিয়েই তাঁর উপর নির্ভরশীল ।

অস্তিত্বদানকারী কারণের বিশেষত্ব:

পূর্ববর্তী আলোচনার উপর ভিত্তি করে অস্তিত্বদানকারী কারণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে :

১। অস্তিত্বদাতা কারণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল কার্যের (معلول) পূর্ণতার (کمالات) অধিকারী হতে হবে যাতে প্রত্যেক সৃষ্টিকে (موجود) তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী দান করতে পারে - যা সহায়কও অন্যান্য বস্তুগত কারণের ব্যতিক্রম । কারণ ঐ কারণগুলো শুধুমাত্র কার্যের (معلول) পরিবর্ধন ও বিবর্তনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং ঐগুলোর (বিবর্তন ও পরিবর্ধন) চূড়ান্তরূপের অধিকারী হওয়া তাদের জন্যে অপরিহার্য নয়। যেমন : মাটিকে উদ্ভিজ্জ পূর্ণতার অধিকারী হওয়া অপরিহার্য নয় অথবা পিতার- মাতাকে সন্তানের পূর্ণতা বা উৎকর্ষের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু অস্তিত্বদানকারী স্রষ্টাকে তাঁর অবিভাজ্যতা ও অবিশ্লিষ্টতা গুণের পাশাপাশি অস্তিত্বগত সকল পূর্ণতার অধিকারী হতে হবে।[১০]

২। অস্তিত্বদানকারী কারণ স্বীয় কার্যকে (معلول) অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করে থাকে। এক কথায় তাকে সৃষ্টি করে থাকে এবং এ সৃষ্টির ফলে তার অস্তিত্ব থেকে কিছুই হ্রাস পায়না। অথচ প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের ভূমিকা শুধুমাত্র কার্যের (معلول) রূপান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যার জন্যে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয়। অনিবার্য অস্তিত্বের সত্তা থেকে কোন কিছুর বিয়োজনের

অর্থ হল, সৃষ্টিকর্তার সত্তাগত বিভাজ্যতা ও পরিবর্তনশীলতা - যার অসারতা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে ।

৩। অস্তিত্বদানকারী কারণ হল একটি প্রকৃত কারণ (علت الحقيقية) । ফলে কার্যের (معلول)বিদ্যমানতার জন্যেও তার অস্তিত্ব অনিবার্য। কিন্ত সহায়ক কারণের (علة الاعدادی) অস্তিত্ব, কার্যের (معلول) জন্যে অপরিহার্য নয়।

অতএব, আহলে সুন্নতের কোন কোন কালামশাস্ত্রবিদগণ থেকে যে বর্ণিত হয়েছে 'এ বিশ্ব, তার বিদ্যমানতার জন্যে স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল নয় ' তা সঠিক নয়। অনুরূপ পাশ্চাত্যের কোন কোন দার্শনিক যে বলে থাকেন, 'প্রকৃতি জগৎ ঘড়ির মত সর্বকালের জন্যে একবার দমকৃত হয়েছে এবং গতিময়তার জন্যে আর খোদার উপর তার কোন নির্ভরতা নেই ' তাও সত্যবহির্ভূত। বরং এ অস্তিত্ব জগৎ সর্বদা সর্বাবস্থায় মহান স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল এবং তিনি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও অস্তিত্বপ্রদান থেকে বিরত হন, তবে আর কোন কিছুই বাকী থাকবে না ।

যদি হবেন বিস্মৃত

ধ্বংস হবে সমস্ত।

৯ম পাঠ

সত্তাগত গুণাবলী

ভূমিকা :

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্, যিনি এ মহাবিশ্বের অস্তিত্বদানকারী কারণ, তিনি অস্তিত্বের সকল প্রকার পূর্ণতার (كمالات) অধিকারী এবং সকল অস্তিত্বশীলে প্রাপ্ত যে কোন প্রকারের উৎকর্ষ তাঁর থেকেই, যার জন্যে তাঁর পূর্ণতা থেকে কোন প্রকার ঘাটতি হয়নি। সহজবোধ্যতার জন্যে কিঞ্চিৎ নিম্নলিখিত উদাহরণটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে :

শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে স্বীয় জ্ঞান থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এর ফলে তার জ্ঞানের কোন ঘাটতি হয় না । তবে মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক দানকৃত অস্তিত্ব ও অস্তিত্বগত উৎকর্ষ এ উদাহরণ অপেক্ষা বহুগুণে সমোন্নত এবং সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে এটাই বলা শ্রেয় যে, অস্তিত্বজগৎ হল পাবিত্র প্রভু সত্তারই দ্যুতি। যেমনটি নিম্নলিখিত কোরানের আয়াত থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি:

(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি (সুরা নূর - ৩৫)

মহান প্রভুর অসীম পূর্ণতা বা কামালতের আলোকে যে সকল ভাবার্থ পূর্ণতার প্রমাণ বহন করবে এবং অপরিহার্যভাবে যে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি থেকে মুক্ত হবে সে সকল ভাবার্থই মহান আল্লাহর জন্যে সত্য হবে। যেমনটি, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, রেওয়ায়েত ও হযরত মাসূমগণের (আঃ) দোয়া ও মোনাজাতসমূহে মহান আল্লাহকে নূর, কামাল, সুন্দর, প্রেমময়, সদানন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ভূষিত করতে দেখা যায়। কিন্ত ইসলামের আক্বায়েদ, দর্শন ও কালামশাস্ত্রে আল্লাহর গুণরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে খোদার গুণসমূহের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গুণ। যেগুলো দু'শ্রেণীতে বিভক্ত (সত্তাগত গুণ ও ক্রিয়াগত গুণ)।

অতএব, সর্বাগ্রে (গুণসমূহের) এ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করব এবং অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গুণের উল্লেখ ও সেগুলির প্রতিপাদনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলী :

খোদার উপর আরোপিত গুণগুলো, হয় খোদার সত্তা সংশ্লিষ্ট এক প্রকার কামাল বা পূর্ণতার ভাবার্থ হবে যেমন : জীবন, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা অথবা মহান প্রভুর সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক- সংশ্লিষ্ট ভাবার্থ যেমন : সৃজনক্ষমতা ও জীবিকাদানের ক্ষমতা হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাবার্থকে 'সত্তাগত গু' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবার্থকে 'ক্রিয়াগত গুণ ' বলা হয়ে থাকে।

এ দু' শ্রেণীর গুণসমূহের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে প্রথম শ্রেণীর গুণগুলো হল প্রভুর পবিত্র সত্তার অভিন্নরূপ; কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণগুলো হল মহান প্রভু ও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্পর্কের প্রকাশক, যেগুলো প্রভুসত্তা ও সৃষ্টিসত্তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্করূপে বিবেচিত হয়। যেমনঃ সৃজন ক্ষমতা, যা প্রভুসত্তার উপর সৃষ্টিসত্তার অস্তিত্বগত সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট গুণ এবং প্রভু ও সৃষ্টিকুলের সংশ্লিষ্টতায় এ সম্পর্ক রূপ লাভ করে । কিন্ত বাস্তবজগতে প্রভুর পবিত্র সত্তা ও সৃষ্টিকুলসত্তা ব্যতীত সৃষ্টিকরণ নামক অপর কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব নেই। তবে মহান প্রভু তাঁর স্বীয় সত্তায় সৃজন ক্ষমতার অধিকারী । কিন্ত ক্ষমতা ' (قدرت) হল প্রভুর সত্তাগত গুণের অন্তর্ভূক্ত। অপরদিকে 'সৃষ্টিকরণ ' অতিরিক্ত গুণের তাৎপর্য বহন করে, যা কার্যক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে থাকে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'সৃজন ' প্রভুর ক্রিয়াগত গুণ বলে পরিগণিত হয় - যদিও তা 'সৃজনে সক্ষম ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা 'ক্ষমতার ' অন্তর্নিহিত বিষয়।

মহান আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোর মধ্যে জীবন (حيات) জ্ঞান (علم) ও ক্ষমতা (قدرت) হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ত শ্রবণ ও দর্শন যদি শ্রবণীয় ও দার্শনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী বলতে বা শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতার অধিকারী বুঝানো হয়, তবে তার মূল প্রজ্ঞাবান ও ক্ষমতাবান এ (সত্তাগত) গুণদ্বয়ের দিকেই ফিরে যায়। আবার যদি এদের (শ্রবণ ও দর্শন) অর্থ

কার্যগত শ্রবণ ও দর্শন হয়ে থাকে, যা শ্রবণকারী ও দর্শনকারীর সত্তা এবং শ্রবণীয় ও দর্শনীয় বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক থেকে বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে তা ক্রিয়াগত গুণ বলে পরিগণিত হবে। যেমন :কখনো কখনো জ্ঞানও (علم) এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং তখন তাকে কার্যগত জ্ঞান(علم الفعلى) বলে নামকরণ করা হয় ।

কোন কোন কালামশাস্ত্রবিদ ভাষা (الكلام) ও ইচ্ছাকেও (الارادة) সত্তাগত গুণের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

সত্তাগত গুণের প্রমাণ :

জীবন, ক্ষমতা ও জ্ঞানকে প্রমাণের জন্যে সর্বাপেক্ষা সরলতম পথটি হল এই যে, এ ভাবার্থগুলোকে যখন সৃষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন এগুলো ঐ সৃষ্ট বিষয়সমূহের পূর্ণতাকে প্রকাশ করে। অতএব ঐগুলো (জীবন, প্রজ্ঞা, ক্ষমতা) অস্তিত্বদানকারী কারণের মধ্যে পূর্ণতম পর্যায়ে থাকা আবশ্যক। কারণ যে কোন সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যেই যে কোন প্রকার উৎকর্ষের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে মহান প্রতিপালক আল্লাহ থেকেই প্রাপ্ত এবং এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, যিনি জীবন দান করবেন, তিনি জীবনের অধিকারী নন। অনুরূপ, যিনি সৃষ্টিকে জ্ঞান ও ক্ষমতা দিবেন তিনি স্বয়ং অজ্ঞ (جاهل) ও ক্ষমতাহীন হবেন - তাও অসম্ভব ।

অতএব কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে প্রাপ্ত এ পূর্ণতা, মহান সৃষ্টিকর্তার মধ্যে এদের চূড়ান্ত পর্যায়ের সমাহারের প্রমাণ বহন করে থাকে। অর্থাৎ (ঐ গুণগুলোর) কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা ও কিঞ্চিৎ পরিমাণের ঘাটতি ছাড়াই মহান সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায় : মহান প্রভু অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও জীবনের অধিকারী। এখন আমরা এদের প্রতিটির জন্যে বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

জীবন:

জীবনের ধারণাটি দু'শ্রেণীর সৃষ্টবস্তর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের একটি হল উদ্ভিদকুল, যারা বিকাশ ও বর্ধনক্ষম এবং অপরটি হল প্রাণী ও মানবকুল, যারা প্রত্যয় ও বোধের অধিকারী। কিন্ত প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও নির্ভরশীলতা অপরিহার্য। কারণ বিকাশ ও বর্ধনের অবিচ্ছেদ্যতা হল যে, বিকাশপ্রাপ্ত অস্তিত্বময়, শুরুতে অপূর্ণাঙ্গ থাকে এবং কোন বহিঃনির্বাহকের প্রভাবে এদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়; অতঃপর পর্যায়ক্রমে নতুন এক পূর্ণতায় পৌঁছে। সতরাং এধরনের কোন বিষয়কে মহান সৃষ্টিকর্তারূপে আখ্যায়িত করা যায় না (যার আলোচনা ইতিপূর্বে না- বোধক গুণের ক্ষেত্রে করা হয়েছে)।

জীবনের দ্বিতীয় অর্থটি হল, পূর্ণতার তাৎপর্যমণ্ডিত। যদিও এর সম্ভাব্য দৃষ্টান্ত (مصداق) ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা সমন্বিত; কিন্ত তার জন্যে অসীম এক মর্যাদাকে বিবেচনা করা যেতে পারে - যেখানে কোন প্রকার ঘাটতি ও নির্ভরশীলতাই আর থাকেনা। অস্তিত্ব ও পূর্ণতার তাৎপর্যও অনুরূপ।

মূলতঃ জীবন যে অর্থে জ্ঞান ও ঐচ্ছিক কার্যসমন্বিত হয়, সে অর্থে অবস্তুগত এক অস্তিত্বতার জন্যে অপরিহার্য । কারণ যদিও জীবন্ত বস্তুর প্রতি জীবনকে অরোপ করা হয়, তথাপি তা(জীবন) হল প্রকৃতপক্ষে এদের (জীবন্ত বস্তুর) আত্মার (روح) বশিষ্ট্য। কিন্ত যেহেতু ঐ বস্তু আত্মার অধিকারী হয়, তাই ভুলবশতঃ তা জীবন্ত বলে বশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। অর্থাৎ যেমন করে বস্তর জন্যে বিস্তার অপরিহার্য, তেমনি নির্বস্তুকের (مجرد বা অবস্তুগত) জন্যও আত্মা (روح) অপরিহার্য । আর এ আলোচনার উপর ভিত্তি করে মহান স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে অপর, একটি দলিল আমাদের হস্তগত হয় । যথা : প্রভুর পবিত্র অস্তিত্ব হল নির্বস্তুক (مجرد) বা অবস্তুগত- যা পূর্ববর্তী পাঠে প্রমাণিত হয়েছে। আর প্রত্যেক নির্বস্তুক অস্তিত্বই সত্তাগতভাবে জীবনের অধিকারী। অতএব মহান আল্লাহও সত্তাগতভাবে জীবনের অধিকারী।

জ্ঞান:

জ্ঞান হল স্বতঃসিদ্ধতম ভাবার্থসমূহের একটি। তবে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে এর যে দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করে থাকি তা সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। সুতরাং এ ধরনের বিশেষত্ব সহকারে মহান প্রভুর উপর তা আরোপযোগ্য হবে না। কিন্তু ইতিপূর্বে যেমনটি উল্লেখ হয়েছে যে, বুদ্ধিবৃত্তি (عقل) এভাবার্থের পূর্ণতার জন্যে এমন কোন দৃষ্টান্তকে বিবেচনা করতে পারে, যার কোন প্রকার অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থাকবে না এবং যা জ্ঞানীর অভিন্ন সত্তার অন্তগত হবে। আর তা- ই হল মহান প্রভুর সেই সত্তাগত গুণ।

প্রভুর জ্ঞানকে একাধিক উপায়ে প্রতিপাদন করা যেতে পারে, যাদের একটি হল সে পথ, যা সকল সত্তাগত গুণের প্রমাণের ক্ষেত্রে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞান বিদ্যমান, সেহেতু তাদের সৃষ্টিকর্তার মধ্যে ও (এ জ্ঞান) চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

(প্রভুর প্রজ্ঞাকে প্রমাণের জন্যে) অপর পথটি সুবিন্যস্ততার দলিলের উপর নির্ভরশীল যা নিম্নরূপ : কোন সৃষ্ট বিষয়ে যতোধিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাস ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হবে, তা ততোধিক অস্তিত্বে আনয়নকারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রমাণ বহন করবে। যেমনঃ কোন তাত্ত্বিক বই অথবা কোন একটি সুন্দর কবিতা কিংবা অন্য যে কোন শিল্পকর্ম, প্রণয়নকারীর জ্ঞান, সুরুচি ও দক্ষতার প্রমাণ বহন করে এবং কখনোই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই এটা ভাবা সম্ভব নয় যে, একটি তাত্ত্বিক অথবা দার্শনিক বই কোন এক অজ্ঞ ও নিরক্ষর ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হয়েছে। অতএব কিরূপে ধারণা করা যায় যে, এত রহস্য ও বিস্ময় সম্বলিত এ মহাবিশ্ব, কোন এক অজ্ঞ অস্তিত্ব কর্তৃক সৃজিত হয়েছে ?

সর্বশেষে (প্রভুর প্রজ্ঞাকে প্রমাণের জন্যে) তৃতীয় পন্থাটি, কতগুলো (অস্বতঃসিদ্ধ) পরোক্ষ (نظری) দার্শনিক প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। যেমন : প্রত্যেক স্বাধীন নির্বস্তুক (مجرد) অস্তিত্বই জ্ঞানের অধিকারী।[১১] (যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহে প্রমানিত হয়েছে)

প্রভুর জ্ঞানের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা আত্মগঠনের জন্যে অতীব গুরুত্বপর্ণ। এজন্যই পবিত্র কোরানে এ সম্পর্কে অনবরত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে :

(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)

মহান আল্লাহ প্রতারকদের চক্ষুসমূহ ও অন্তরের রহস্যসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন (সুরা মুমিন- ১৯) ।

ক্ষমতা :

যদি কর্তা স্বীয় কর্মকে স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করে থাকেন তবে বলা হয়ে থাকে যে, তার কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা (قدرت) রয়েছে। অতএব ক্ষমতা বলতে বুঝায় সম্ভবপর সকল কার্যের জন্যে স্বাধীন কোন কর্তার সক্ষমতাকে। কর্তা অস্তিত্বের মর্যাদার দৃষ্টিতে যতবেশী পরিপূর্ণ হবে ততবেশী ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং যে অস্তিত্ব অসীম পূর্ণতার অধিকারী, তার ক্ষমতা হবে অপরিসীম।

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

- নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান (সুরা বাকারা- ২০) ।এখানে কয়েকটি বিষয় স্মরণযোগ্য :

১। যে সকল কর্ম ক্ষমতার আওতায় বলে পরিগণিত সে সকল কর্মের বাস্তব রূপ লাভের সম্ভাব্যতা থাকা অনিবার্য। অতএব যা কিছু সত্তাগতভাবে অসম্ভব অথবা অপরিহার্যরূপে অসম্ভব তা ক্ষমতার আওতাধীন বলে পরিগণিত হয় না। 'আর সকল কিছুর উপর প্রভুর ক্ষমতা আছে ' তার মানে এ নয় যে, খোদা অন্য এক খোদাকে সৃষ্টি করতে পারেন (কারণ খোদাকে সৃষ্টি করা অসম্ভব) অথবা খোদা পারেন ২, সংখ্যাটি যে অর্থে ২ তাকে ৩ (যে অর্থে ৩) অপেক্ষা বৃহত্তর করতে অথবা সন্তানকে সন্তান হিসেবে পিতার পূর্বে সৃষ্টি করতে।

২। সকল কর্ম সাধনের ক্ষমতা থাকার অর্থ এ নয় যে, ঐ কর্মগুলোর সব ক'টিই তিনি অপরিহার্যরূপে কার্যকর করবেন। বরং যা তিনি ইচ্ছা করবেন তা- ই করবেন এবং প্রজ্ঞাবান প্রভু

যথোপযুক্ত ও জ্ঞানগর্ভ কর্ম ব্যতীত কোন কর্ম কামনা করেন না ও সম্পাদন করেন না - যদিও তিনি অনাকাঙ্খিত ও অপছন্দনীয় কর্ম সম্পাদনে সক্ষম । পরবর্তী পাঠসমূহে খোদার প্রজ্ঞা (حكمت) সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান করা হবে ।

৩। ক্ষমতা, আলোচ্য অর্থে স্বাধীনতা বা নির্বাচন ক্ষমতাকেও সমন্বিত করে এবং মহান আল্লাহ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি পূর্ণ স্বাধীনতারও অধিকারী। কোন কিছুই তাঁকে স্বীয় কর্মসম্পাদনে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না বা তার স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারেনা। কারণ সকল সৃষ্ট বিষয়েরই অস্তিত্ব ও শক্তি তাঁর থেকে প্রাপ্ত এবং যে শক্তি ও ক্ষমতা তিনি অপরকে দান করেছেন কখনোই সে শক্তি ও ক্ষমতার বশ্যতা তিনি স্বীকার করেন না ।

১০ম পাঠ

ক্রিয়াগত গুণাবলী

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রিয়াগত গুণসমূহ বলতে বুঝায় সে সকল ভাবার্থকেই, যা প্রভুসত্তাকে তাঁর সৃষ্ট বিষয়সমূহের সাথে তুলনা করতঃ এ দুয়ের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক থেকে বোধগম্য হয়ে থাকে। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট বিষয় এ দুয়ের সমন্বয়ে এ সম্পর্ক রূপ লাভ করে। যেমন : স্বয়ং 'সৃজন ' যা মহান আল্লাহর উপর সৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্বের নির্ভরশীলতাকে বুঝায় এবং যদি এ সম্পর্ককে (সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি বিষয়ের যুগপৎ সম্পর্ক) বিবেচনা না করা হয়, তবে এ ধরনের ভাবার্থ আমাদের হস্তগত হয় না।

প্রভু এবং সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিবেচ্য সম্পর্কসমূহকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবে, এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ গুলোকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে :

এক শ্রেণীর সম্পর্ক আছে, যেগুলো প্রভু এবং সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে বিবেচ্য। যেমন : অস্তিত্ব দান, সৃষ্টি, অভূতপূর্ব সৃষ্টি ইত্যাদি। অপর এক শ্রেণীর সম্পর্ক হল, যা অন্য কোন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। যেমন : রিজক্ (অন্নদান)। কারণ সর্বাগ্রে অন্নগহণকারীর অস্ত্রিত্বকে, ঐ সকল উপাদান যেগুলো থেকে সে রুযী গ্রহণ করে সেগুলোর সাথে বিবেচনা করতঃ প্রভুর পক্ষ থেকে যে তা (রুযী) প্রদত্ত হয়ে থাকে, সেটা বিবেচিত হয়ে থাকে। আর কেবলমাত্র তখই অন্নদাতা (رازق) ও প্রকৃত অন্নদাতার (رزّاق) ধারণা অর্জিত হয়। এমনকি কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে, প্রভুর ক্রিয়াগত গুণের ধারণা অর্জিত হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং সৃষ্টিকুলের মধ্যে একাধিক সম্পর্ক বিবেচনায় আসে। অতঃপর ঐ গুলোর সম্পর্ককে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়, অথবা প্রভু ও সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান একাধিক আদি সম্পর্কের ফলশ্রুতিস্বরূপ কোন সম্পর্করূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন : ক্ষমা (مغفرة) যা প্রভুর বিধিগত

বা অনির্ধারিত প্রভুত্ব(ربوبيت تشريعى), কার্যকরী আইন প্রণয়ন এবং বান্দার অবাধ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

অতএব প্রভুর ক্রিয়াগত গুণাবলী সম্পর্কে জানতে হলে মহান প্রভু ও তার সৃষ্ট জগতের মধ্যে তুলনা করতঃ এতদুভয়ের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ককে বিবেচনা করতে হবে, যাতে প্রভু ও সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রভুর পবিত্র সত্তাকে বিবেচনা করলে ক্রিয়াগত গুণাবলীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। আর এটাই হল প্রভুর সত্তাগত গুণাবলী ও ক্রিয়াগত গুণাবলীর মধ্যে মূল পার্থক্য।

তবে ইতিপূর্বে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রিয়াগত গুণসমূহকে তাদের উৎসের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে, তারা সত্তাগত গুণে প্রত্যাবর্তন করে। যেমন : সৃষ্টিকর্তাকে যদি 'সৃষ্টি করতে সক্ষম ' এমন কাউকে বোঝানোর ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় তবে তা ক্ষমতা নামক গুণের দিকে ফিরে যায় অথবা শ্রবণ ও দর্শন যদি 'শ্রবণযোগ্য ও দর্শনযোগ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তা প্রজ্ঞা নামক গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ।

অপরদিকে সত্তাগত গুণের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ভাবার্থ সম্বন্ধসূচক বা ক্রিয়ামূলক অর্থে বিবেচিত হয় এবং এ অবস্থায় ঐগুলো ক্রিয়াগত গুণ বলে পরিগণিত হয়। যেমন : পবিত্র কোরানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রজ্ঞা (علم) শব্দটি ক্রিয়াগত গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করা সমীচীন বলে মনে করছি। নিম্নে তা বর্ণিত হল :

যখন প্রভু ও বস্তুগত অস্তিত্বের মধ্যে কোন সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় এবং এর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর জন্যে বিশেষ ক্রিয়াগত গুণের ধারণার প্রকাশ ঘটে, তখন উল্লেখিত গুণ, বস্তুগত অস্তিত্বসমূহ, যেগুলো (দ্বিপাক্ষিক) সম্পর্কের এক পক্ষের ভূমিকায় অবস্থান করে, তাদের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে স্থান ও কালের শর্তাধীন হয়ে পড়ে। তবে (দ্বিপাক্ষিক) সম্পর্কের

অপরপক্ষ, মহান আল্লাহর সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে (উল্লেখিত গুণগুলো) এ ধরনের (উপরে বর্ণিত) কোন শর্ত ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, অন্নগ্রাহককে অন্নদান, কোন এক বিশেষ স্থান ও কালে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এ শর্তগুলো প্রকৃতপক্ষে অন্নগ্রাহক- অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট- অন্নদাতার সাথে নয়। আর প্রভুর্ পবিত্র সত্তা কোন প্রকার স্থান ও কালের শর্ত থেকে পবিত্র।

এটি একটি অতি সূক্ষ¥ ব্যাপার এবং মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণ ও কর্ম কাণ্ডের পরিচিতির ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠিস্বরূপ, যেগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তার্কিক ও মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সৃজনক্ষমতা

সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহের উৎপত্তির ক্ষেত্রে, প্রারম্ভিক কারণরূপে অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণের পর এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহ স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে সর্বদা ঐ অনিবার্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল এটা বিবেচনার পর, অনিবার্য অস্তিত্বের জন্যে 'সৃজনক্ষমতা ' এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বের জন্যে 'সৃজিত ' গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টিকর্তার ধারণা, যা অস্তিত্বের এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রকাশ পায়, তা অস্তিত্বদানকারী কারণের বা অস্তিত্বে আনয়নকারীর সমান এবং সকল সম্ভাব্য ও নির্ভরশীল অস্তিত্ব তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত পক্ষ হিসেবে 'সৃজিত ' বলে গুণান্বিত হয়ে থাকে ।

তবে কখনো কখনো সৃজন (خلق) শব্দটি, কিছুটা সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং শুধুমাত্র ঐ সকল অস্তিত্বের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়, যারা প্রারম্ভিক বস্তু থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর এর বিপরীতে 'অভূতপূর্ব সৃষ্টি ' (ابداع) নামক অপর এক ভাবার্থ, যা ঐ সকল অস্তিত্ব যারা কোন প্রাথমিক বস্তু থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত নয়, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (যেমন : নির্বস্তুকসমূহ¡ ' এবং প্রারম্ভিক বস্তসমূহ)। আর এরূপে অস্তিত্বদান- সৃষ্টিকরণ (خلق) ও অভূতপূর্ব সৃষ্টিকরণ (ابداع) , এদু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে।

যা হোক, আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টিকরণ, মানুষ কর্তৃক একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে কোন কৃত্রিম সৃষ্টির মত নয় যে, গতি এবং দহিক অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল হবে এবং গতি ' ক্রিয়া ' নামে ও এর ফলে অর্জিত বিষয় 'ক্রিয়ার ফল ' নামে পরিচিত হবে । অনুরূপ, এমন নয় যে, সৃষ্টিকরণ এক ব্যাপার আর 'সৃষ্ট বিষয় ' অন্য ব্যাপার। কারণ মহান আল্লাহ বস্তুগত গতি ও বস্তুগত বশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। যদি 'সৃষ্টিকরণ ' সৃষ্ট সত্তার উপর বর্তিত অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত (مصداق) হত, তবে তা 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব ' ও 'সৃষ্ট বিষয়সমূহের ' মধ্যে একটি বলে পরিগণিত হয়। ফলে এর (সৃষ্টিকরণের) সৃষ্টি সম্পর্কে একাধিক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটত। অথচ ক্রিয়াগত গুণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, এ ধরনের গুণ প্রভু ও সৃষ্ট বিষয়ের সম্পর্ককে বিবেচনা করে বোধগম্য হয়ে থাকে। আর এ সম্পর্ক বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য।

প্রতিপালনক্ষমতা

বিশেষ করে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়, তা হল : সৃষ্ট বিষয়সমূহ শুধুমাত্র মূল অস্তিত্ব ও উৎপত্তির জন্যেই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সমস্ত অস্তিত্বের জন্যেই মহান প্রভুর উপর নির্ভরশীল এবং কোন প্রকারেই স্বাধীন নয় । মহান প্রভু যেভাবেই ইচ্ছা করেন, সেভাবেই সৃষ্ট বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং তিনিই ঐগুলোর যাবতীয় বিষয়ে তত্বাবধান করে থাকেন ।

যখন এ সম্পর্ককে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয় তখন প্রতিপালন ক্ষমতার ধারণা পাওয়া যায়, যার ফলশ্রুতি হল তত্বাবধান এবং এর দৃষ্টান্ত অনেক। যেমন : রক্ষা, পরিচর্যা, জীবনদান ও মৃত্যদান, অন্নদান, বিকাশ ও উৎকর্ষে পৌঁছানো, পথ প্রদর্শন এবং আদেশ- নিষেধের বিষয়রূপে স্থান দান ইত্যাদি।

প্রকরণভেদে প্রতিপালনের পর্যায়গুলোকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে সুনির্ধারিত ও বিধিগত ।

সুনির্ধারিত প্রতিপালন (ربوبیت تکوینی) সকল সৃষ্ট বিষয় ও ঐ গুলোর প্রয়োজন ও চাহিদাকে পূরণ তথা সমগ্র বিশ্ব পরিচালনাকে সমন্বিত করে। আর বিধিগত প্রতিপালন (ربوبیت تشریعی) শুধুমাত্র সচেতন ও ইচ্ছার অধিকারী অস্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট এবং ঐশী কিতাবসমূহ ও নবী- রাসূল প্রেরণ, দায়িত্ব নির্ধারণ ও আদেশ - নিষেধ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ।

সুতরাং প্রভুর নিরংকুশ প্রতিপালন ক্ষমতার অর্থ হল : সৃষ্ট বিষয়সমূহ তাদের অস্তিত্বের সকলস্তরেই মহান প্রভুর উপর নির্ভরশীল এবং তাদের পারস্পরিক যে নির্ভরশীলতা, পরিশেষে তার পরিসমাপ্তি মহান সৃষ্টিকর্তাতেই ঘটে। তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর সৃষ্টির এক অংশ দিয়ে অপর অংশকে তত্ত্বাবধান করেন, অন্নগ্রাহককে সৃষ্ট অন্ন থেকে অন্ন দান করেন, সচেতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তাকে আভ্যন্তরীণ মাধ্যম (যেমন : আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তি এবং অন্যান্য বোধশক্তি) এবং বাহ্যিক মাধ্যম (যেমন : নবীগণ ও ঐশী কিতাবসমূহ) দ্বারা পথনির্দেশ করেন এবং মানুষের জন্যে নীতি প্রণয়ন, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেন।

প্রতিপালনও সৃজনক্ষমতার মত সম্বন্ধীয় (اضافی) ভাবার্থযুক্ত। তবে পার্থক্য হল এই যে, প্রতিপালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্ককেও বিবেচনা করা হয়, যা রিযক প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ।

প্রতিপালন ও সৃজনের অর্থের আলোকে এবং তাদের সম্বন্ধযুক্ত হওয়া থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'টি গুণ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর এটা অসম্ভব যে, বিশ্বের প্রতিপালক এর সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য কেউ হবেন, বরং তিনিই হবেন এ বিশ্বের পরিচালক ও রক্ষাকর্তা, যিনি এ সকল সৃষ্টিকে সতন্ত্র বশিষ্ট্য সহকারে এবং পারস্পরের উপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিপালন ক্ষমতা, পরিচালন ক্ষমতার তাৎপর্য, সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান সংহতি থেকে প্রকাশ লাভ করে।

প্রভুত্ব

ইলাহ ও উলুহিয়্যাতের (الوهيت) স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তাবিদগণের মধ্যে একাধিক বক্তব্য প্রচলিত, যা কোরানের বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে বিদ্যমান । যে অর্থটি আমাদের মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তা হল : ইলাহ্ (اله) অর্থ উপাস্য অথবা আনুগত্য ও উপাসনার যোগ্য । যেমন : বইয়ের অর্থ হল লেখ্য এবং যা লিখনযোগ্যতা রাখে ।

এ অর্থানুসারে উলুহিয়্যাত হল এমন এক গুণ, যার ধারণা লাভের জন্যে বান্দাগণের উপাসনা ও আনুগত্যকেও বিবেচনা করতে হবে। যদিও পথভ্রষ্টরা মিথ্যা মাবুদগুলোকে নিজেদের উপাস্যরূপে নির্বাচন করেছে, তবু তিনিই হলেন প্রকৃত উপাসনা ও আনুগত্যের যোগ্য - যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। বিশ্বাসের এ ন্যূনতম সীমা, যা আপন প্রভুর প্রতি সকল বান্দারই থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে অনিবার্য অস্তিত্ব, সৃষ্টিকারী, বিশ্বের স্বনির্ভর পরিচালক হিসেবে চিনার পাশাপাশি তাঁকে উপাসনা ও আনুগত্যের যোগ্য হিসেবেও জানতে হবে। আর এ কারণেই ইসলাম (لا اله الا الله) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এ ধ্বনিকে স্বীয় শ্লোগানরূপে নির্বাচন করেছে।

১১তম পাঠ

অ া ক্রিয়াগত গুণাবলী

ভূমিকা

কালামশাস্ত্রের একটি জটিলতম বিষয় হল প্রভুর ইচ্ছা বা প্রত্যয় (اراده)। বিভিন্ন দিক থেকে এ বিষয়টি আলোচনা ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয় রূপে পরিগণিত। যেমন : ইচ্ছা বা প্রত্যয় কি সত্তাগত গুণ, না ক্রিয়াগত গুণ? প্রাচীন (قديم) , না সৃষ্ট (حادث) ? একত্ব, না বহুত্ব ? ইত্যাদি।

এতদসত্বেও দর্শনশাস্ত্রে 'চূড়ান্ত প্রত্যয় বা ইচ্ছা' শিরোনামে একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে, বিশেষ করে প্রভুর ইচ্ছা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

এটা অনস্বীকার্য যে, এ বইয়ের ক্ষুদ্র কলেবরে এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না । সুতরাং প্রারম্ভেই ইচ্ছা বা প্রত্যয়ের তাৎপর্য তুলে ধরব । অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করব ।

ইচ্ছা বা প্রত্যয়

ইচ্ছা বা প্রত্যয় (اراده) শব্দটি প্রচলিত ভাষায় কমপক্ষে দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় : একটি হল 'পছন্দ করা' আর অপরটি হল 'কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া' ।

প্রথম অর্থটি বিষয়ের ভিত্তিতে অত্যন্ত ব্যাপক এবং বাস্তব বস্তসমূহকে পছন্দকরণ[১৩], ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং অপরের কার্যকলাপকেও সমন্বিত করে। দ্বিতীয় অর্থটি হল এর ব্যতিক্রম, যা শুধুমাত্র স্বয়ং ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

ইরাদা শব্দটি প্রথম অর্থে পছন্দ (محبت) যদিও মানুষের ক্ষেত্রে নফসের কামনারূপে পরিগণিত হয় তবু বুদ্ধিবৃত্তি এর ঘাটতিপূর্ণ দিকগুলোকে নিষ্কাশন করে একটি সাধারণ অর্থকে হস্তগত করতে

পারে, যার পরিসীমা বস্তুগত সত্তা থেকে শুরু করে মহান আল্লাহ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। যেমনটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দ (حب), যা স্বীয় সত্তা সম্পর্কে প্রভুর পছন্দকেও সমন্বিত করে, তাকে সত্তাগত গুণরূপে গণনা করা যেতে পারে।

অতএব, যদি প্রভুর 'ইরাদা ' বা (ইচ্ছা) বলতে পূর্ণতাকে পছন্দ করা বুঝায়, যা প্রথম পর্যায়ে প্রভুর অসীম পূর্ণতা সংশ্লিষ্ট হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অস্তিত্বময়, যারা প্রকারান্তরে প্রভুর পূর্ণতারই নিদর্শন, তাদেরকে সমন্বিত করে তবে তা (ইরাদা) সত্তাগত গুণ রূপে পরিগণিত হতে পারে। আর তখন অন্যান্য সত্তাগত গুণের মতই ইরাদাকেও প্রাচীন (قديم) একক এবং প্রভুর পবিত্র সত্তার অভিন্ন রূপ বলে মনে করা যেতে পারে ।

কিন্তু 'ইরাদা ' (দ্বিতীয় অর্থে) কর্মসম্পাদনে সিদ্ধান্ত নেয়া অর্থে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াগত গুণের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সৃষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে কালের শর্তে আবদ্ধ হয় - যেমনটি পবিত্র কোরানে এসেছে ।

(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

তার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন 'হও ' ফলে তা হয়ে যায় (সুরা ইয়াসিন - ৮২)।

তবে মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ ক্রিয়াগত গুণাবলী গুণান্বিত, তা এ অর্থে নয় যে, তার সত্তায় কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অথবা কোন উপজাত (عوارض) তার জাত বা সত্তায় সংযোজিত হয়েছে । বরং এ অর্থে যে, নির্দিষ্ট শর্তে ও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভুসত্তা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় এবং বিশেষ এক সম্পর্কের ভাবার্থকে প্রভুর ক্রিয়াগত গুণ হিসাবে গণনা করা হয় ।

'ইরাদার ' ক্ষেত্রে এ সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় যে, সকল সৃষ্ট বিষয়ই যে দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের অধিকারী সে দৃষ্টিকোণ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। অতএব, তার অস্তিত্ব

বিশেষ স্থান ও কাল অথবা বিশেষ অবস্থা, প্রভুর পছন্দ ও জ্ঞানের অধীনে হয়েছে এবং মহান আল্লাহ স্বেচ্ছায় তাকে সৃষ্টি করেছেন - অন্য কারো কর্তৃক বাধ্য হয়ে নয়। এ সম্পর্ক বিবেচনার ফলে ইরাদা নামক এক সম্বন্ধযুক্ত ভাবার্থ প্রকাশ লাভ করে, যা সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন কোন বস্তুর সংশ্লিষ্ট হলে সীমাবদ্ধও শর্তাধীন হয়ে থাকে এবং এ সম্বন্ধযুক্ত ভাবার্থই তখন সৃজিত (حدوث) ও বহুত্ব (كثرت) বলে গুণান্বিত হয়ে থাকে। কারণ সম্বন্ধ(اضافه) , দু'পক্ষের (طرفين) অধীন হয়ে থাকে এবং সৃজিত (حدوث)ও বহুত্ব (كثرت) হল দু'পক্ষের মধ্যে একপক্ষ। এদিক থেকে উল্লেখিত বশিষ্ট্যসমূহ)সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন (সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়াই যুক্তিসংগত ।

প্রজ্ঞা :

'ইরাদার ' উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রভুর এ ইরাদা বা ইচ্ছা অর্থহীন ও পরিকল্পনাবিহীন কোন কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং যা কিছু মূলতঃ প্রভুর ইরাদার অন্তর্ভুক্ত হয় তাই বস্তুর পূর্ণতা ও কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। যেহেতু বস্তুসমষ্টির এক অংশ অপর অংশের ক্ষতির কারণ হয় সেহেতু প্রভুর পূর্ণতাপ্রীতির দাবী হল সৃষ্টিকুল এমনভাবে অস্তিত্বমান হবে যে, সমষ্টিগত কল্যাণ ও পূর্ণতার লব্ধি সর্বাধিক হবে। এ ধরনের সম্পর্কসমূহকে বিবেচনা করলে কল্যাণ নামক ভাবার্থের সন্ধান মেলে। নতুবা কল্যাণ (مصلحت) সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব থেকে এমন কোন স্বাধীন বিষয় নয় যে তাদের বিদ্যমানতায় কোন প্রভাব ফেলবে। সুতরাং এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তা প্রভুর ইরাদায় প্রভাব ফেলবে ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, যেহেতু প্রভুর ক্রিয়া তাঁর সত্তাগুণ(যেমন : জ্ঞান, ক্ষমতা, পূর্ণতা ও কল্যাণপ্রীতি) থেকে উৎসারিত, সেহেতু সর্বদা এরূপে বাস্তবায়িত হয় যখন তা কল্যাণকর হয়। অর্থাৎ সৃষ্ট বিষয় সর্বাধিক কল্যাণ ও পূর্ণতার অধিকারী হবে। আর এ ধরনের ইরাদা বা ইচ্ছাকেই প্রজ্ঞাপূর্ণ ইরাদা বলা হয়ে থাকে। এখানে মহান আল্লাহর জন্যে

কার্যক্ষেত্রে প্রজ্ঞা নামক অপর একটি গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণের মতই প্রভুর সত্তাগত গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, কল্যাণের জন্যে কর্মসম্পাদনের অর্থ এ নয় যে, কল্যাণই হল প্রভুর জন্যে চূড়ান্ত কারণ। বরং তা এক ধরনের গৌণ ও অধঃস্তন উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হয় । অপরদিকে কর্ম সম্পাদনের জন্যে চূড়ান্ত কারণ হল, সে অনন্ত সত্তাগত পূর্ণতার অনুরাগ, যা আনুসঙ্গিকভাবে তার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অস্তিত্বময় বিষয়সমূহের পূর্ণতাকেও সমন্বিত করে। আর এ জন্যেই বলা হয়, প্রভুর কর্মকাণ্ডের জন্যে সে কর্তৃকারণই হল চূড়ান্ত কারণ এবং মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা বহিঃভূত কোন উদ্দেশ্যও আকাঙ্খা পোষণ করেন না। তবে সৃষ্ট বিষয়ের পূর্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ, গৌণ উদ্দেশ্য বা অধঃস্তন উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হলেও তা উল্লেখিত বিষয়টির সাথে কোন বিরোধ রাখেনা। আর এ জন্যেই প্রভুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পবিত্র কোরানে এমন সকল বিষয়কে কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেরই মূলে রয়েছে সৃষ্ট বিষয়ের পূর্ণতা ও কল্যাণ[১৪]। যেমন : পরীক্ষীত কর্মসমূহকে নির্বাচন, আল্লাহর দাসত্ব করা এবং প্রভুর বিশেষ ও অপরিসীম অনুগ্রহের অধিকারী হওয়া ইত্যাদিকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই যথাক্রমে অপরের প্রারম্ভিকা(مقدمه)।

প্রভুর ভাষা

মহান আল্লাহর উপর আরোপিত ভাবার্থসমূহের মধ্যে একটি হল কথোপকথন বা কালাম(کلام)।

প্রভুর কথোপকথন সম্পর্কে, প্রাচীনকাল থেকেই কালামশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে আলোচনা প্রচলিত ছিল। কথিত আছে 'কালামশাস্ত্র ' নামকরণের কারণও হল এটাই যে, এ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ প্রভুর ভাষা বা কালাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আশায়েরীরা এটাকে সত্তাগত গুণ এবং মুতাযেলীরা ক্রিয়াগত গুণ বলে মনে করতেন। এ দু'দলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে

একটি হল উল্লেখিত বিষয়টি । বলা হয় কোরান যে, আল্লাহর কালাম বা ভাষা, তা কি সৃষ্ট, না সৃষ্ট নয় ? আর এ বিষয়টির জন্যে এমনকি পরস্পর পরস্পরকে কাফের পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছেন!

সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলীর সংজ্ঞার আলোকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, কথোপকথন হল ক্রিয়াগত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যাকে অনুধাবনের জন্যে এমন এক শ্রোতাকেও বিবেচনা করতে হবে, যিনি বক্তার উদ্দেশ্যকে শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে বা লিখিত অবস্থায় দেখার মাধ্যমে অথবা স্বীয় মস্তিষ্কে কোন ভাবার্থ অনুধাবনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন ভাবে বুঝতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ভাবার্থটি প্রভু (যিনি এক সত্যকে কারো কাছে প্রকাশ করতে চান) এবং শ্রোতার (যিনি ঐ সত্যকে অনুধাবন করেন) সম্পর্ক থেকে প্রকাশ লাভ করে (যা ক্রিয়াগত গুণের প্রমাণবহ)। কিন্তু যদি কথোপকথনের জন্যে অন্যকোন অর্থকে বিবেচনা করা হয়; যথা : কথনক্ষমতা, বক্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে জ্ঞান, এধরনের অর্থের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তবে এ অবস্থায় এ গুণটি (কথোপকথন) পূর্বোল্লেখিত কোন কোন ক্রিয়াগতগুণের মতই সত্তাগত গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে ।

কিন্তু কোরান বলতে আক্ষরিক লিপি বা শব্দসমষ্টি বা মস্তিষ্কে বিদ্যমান ভাবার্থসমূহ অথবা তার (কোরানের) জ্যোতির্ময় ও নির্বস্তুক বাস্তবরূপকে বুঝানো হলে, তা সৃষ্ট বিষয় বলে পরিগণিত হবে। ‘ তবে যদি কেউ আল্লাহর সত্তাগত জ্ঞানকে কোরানের বাস্তবরূপ বলে মূল্যায়ন করে থাকেন, তাহলে তার প্রত্যাবর্তন প্রভুর সত্তাগত গুণ জ্ঞানের দিকে ঘটবে । কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা সর্বজন স্বীকৃত নয় বলে পরিত্যাজ্য ।

সত্যবাদিতা

প্রভুর কথন যদি আদেশ, নিষেধ ও প্রশ্নবোধক হয়, তবে তা বান্দাগণের কর্তব্যকে নির্দেশ করে থাকে এবং তখন তার উপর সত্য বা মিথ্যা আরোপিত হয় না। কিন্তু যদি প্রভুর কথন বিবৃতিমূলক হয়, যা বাস্তব অস্তিত্বসমূহ অথবা পরবর্তী ও পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সংবাদ বহন করে তবে তা সত্য বলে অভিষিক্ত হয়। যেমন পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে :

(وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا)

কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী (সুরা নিসা- ৮৭) ?

সুতরাং কেউই ঐগুলোকে কোন অজুহাতেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য গুণ, বিশ্বদৃষ্টির গৌণ বিষয়গুলোকে এবং অধিকাংশ মতাদর্শগত বিষয়কে প্রতিপাদন করার জন্যে অপর এক শ্রেণীর যুক্তির (বিশ্বাস ও বিবৃতিমূলক) বধতা দান করে। উল্লেখিত গুণটির প্রমাণের জন্যে, বিশেষ করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিটির অবতারণা করা যায় তাহল :

প্রভুর কথা বলা, প্রতিপালকত্বের মর্যাদায় এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে, মানুষ ও বিশ্বজগতের পরিচালনার ক্ষেত্রে, সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে পথনির্দেশনার ও সঠিক পরিচিতির ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে– অপরিহার্য। যদি এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বর্ণিত বিষয়গুলোর কোন বিশ্বস্ততা থাকবে–না । কারণ তা উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী।

১২তম পাঠ

বিচ্যুতির কারণসমূহের পর্যলোচনা

ভূমিকা

প্রথম পাঠে পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বদৃষ্টিসমূহকে দু'টি সার্বিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়- ঐশ্বরিক ও বস্তুবাদী। এতদ্ভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হল, সর্বজ্ঞ ও মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে । প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি এক মৌলিক ভিত্তিরূপে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস থেকে রূপ পরিগ্রহ করে । অপরদিকে বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি এ বিশ্বাসকে অস্বীকার করে ।

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে, এ বইয়ের আওতায় যতটুকু সম্ভব সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রতিপাদন করা ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গুণসমূহ অর্থাৎ হ্যাঁ- বোধক ও না- বোধক এবং সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছিল।

এখন এ মৌলিক ভিত্তির উপর বিশ্বাসের দৃঢ়তা বর্ধনের নিমিত্তে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির কিঞ্চিৎ সমালোচনায় মনোনিবেশ করব, যাতে ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টির অবস্থান সুস্থিতকরণের পাশাপাশি বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির অসারতা ও অক্ষমতা প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হয় ।

এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে ঐশী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুতি ও নাস্তিক্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঝোঁকের কারণ ও নির্বাহক সম্পর্কে আলোকপাত করব। অতঃপর বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির দুর্বলতম দিকগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করব ।

বিচ্যুতির কারণসমূহ

মানবজাতির ইতিহাসে নাস্তিকতা ও বস্তুবাদিতার এক সুপ্রাচীন ভিত্তি রয়েছে। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায়, মানব সমাজে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস যেমন বজায় ছিল, তেমনি অতি প্রাচীনকাল থেকেই নাস্তিক্য ধারণার অনুসারী ব্যক্তি ও

গোষ্ঠীরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্মহীনতার প্রচলন অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইউরোপে আরম্ভ হয়েছিল এবং উত্তর উত্তরতা বিশ্বের অন্যত্র বিস্তার লাভ করেছিল । সৃষ্টিকর্তার প্রতি এ আস্থাহীনতা গীর্জাপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপত্তি লাভ করলেও অন্যান্য ধর্ম ও মাযহাবেও এ তরঙ্গের ছোঁয়া লেগেছিল । ধর্মবিবর্জন প্রবণতা, পাশ্চাত্য শিল্প, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যত্র। গত শতাব্দীতে এ ধর্মহীনতা মার্কসবাদের সামাজিকও অর্থনৈতিক ধারণা নিয়ে অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যা বিশ্বমানবতার জন্যে এক মহাবিপদ। এ বিচ্যুতির উৎপত্তি, বর্ধন ও বিস্তৃতির কারণ অনেক এবং এদের সবগুলোর পর্যালোচনার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বইয়ের প্রয়োজন। তবে সার্বিকভাবে তৃবিধ কারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। মানসিক কারণ : ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার জন্যে দায়ী এমন সকল প্রবণতা মানুষের মধ্যে থাকতে পারে, যার প্রভাব সম্পর্কে স্বয়ং ব্যক্তিও অবগত নয়। এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল আরামপ্রিয়তা, উদাসীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। অর্থাৎ একদিকে যেমন গবেষণা ও অনুসন্ধানের মত শ্রমসাধ্য কর্ম, বিশেষ করে সে সকল বিষয়ের জন্যে যেগুলোতে বস্তুগত কোন স্বাদ- আনন্দ নেই, তা অলস, আরামপ্রিয়, অক্ষম ব্যক্তির জন্যে কঠিন; তেমনি অপরদিকে পাশবিক স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অবাধ্যতা তাদেরকে ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি থেকে বিরত রাখে। কারণ ঐশীমতবাদকে গ্রহণ এবং মহান প্রভুর প্রতি বিশ্বাসের ফলে অন্য এক শ্রেণীর বিশ্বাস রূপ পরিগ্রহ করে, যার অবিচ্ছেদ্যতা হল সকল স্বাধীন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব পরায়ণতা । আর এ ধরনের দায়িত্বপরায়ণতার দাবি হল, স্বীয় কামনার অধিকাংশ বিষয়কে পরিত্যাগ করা এবং এক প্রকার সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করা। অপরপক্ষে এ ধরনের সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করা উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ নয় । ফলে এ ধরনের পাশবিক ইচ্ছা অবচেতনভাবে হলেও দায়িত্বপরায়ণতার মূলে আঘাতের কারণ এবং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকারের মূল । এ ছাড়াও কিছু মানসিক কারণ রয়েছে যা ধর্মহীনত প্রবণতাকে প্রভাবিত করে এবং অন্যান্য কারণের পশ্চাতে আত্মপ্রকাশ করে ।

২। সামাজিক কারণ : কোন কোন সমাজে অনাকাঙ্খিত সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এর উৎপত্তি ও বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। এ অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ, যারা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং কোন বিষয়ের প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণে মাধ্যমে সংঘঠিত ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে অপারগ, তারা মনে করেন যে, এ বিশৃঙ্খল অবস্থা ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের অনুপবেশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা এর দায়িত্বভার দ্বীন ও ধর্মের উপর অর্পণ করেন এবং বলেন যে, ধর্মবিশ্বাসসমূহই এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পারিস্থিতি সৃষ্টির কারণ। এ কারণে তারা ধর্ম ও মাযহাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

এ শ্রেণীর কারণের স্পষ্ট দৃষ্টান্তরূপে রেনেসাঁ যুগের ইউরোপের সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে তদানীন্তন গীর্জাপতিদের অযোগ্য কর্মকাণ্ডই খ্রীষ্টবাদ এবং সামগ্রিকভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এ ধরনের কারণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা সকল ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের জন্যে অতীব প্রয়োজন, যাতে স্বীয় দায়িত্বের গুরুত্ব ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে পারেন। অনুরূপ স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের সামান্য ভুল-ত্রুটিই একটি সমাজের বিপথগামিতা ও দুর্দশার কারণ হতে পারে।

৩। চিন্তাগত কারণ : সন্দেহ ও দ্বিধা, যা ব্যত্তির মস্তিষ্কে আসে, তা হয়তো অন্য কারো মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং যুক্তি ও চিন্তাশক্তির দুর্বলতার ফলে, সে ঐ গুলোকে খণ্ডন করতে পারে না । ফলে ন্যূনতম পক্ষে হলেও সে ঐ সন্দেহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং তার মস্তিষ্ককে দোদুল্যমান ও অস্থিতিশীল করে থাকে, যা সন্দেহাতীত ও সুস্থিত বিশ্বাস সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে ।

এ শ্রেণীর কারণসমূহও স্বয়ং একাধিক শাখায় বিভক্ত। যেমন : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ভিত্তিক সনহ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসপ্রসূত সন্দেহ, অপব্যাখ্যা ও দুর্বল যুক্তি-ফলপ্রসূত সন্দেহ, অপ্রীতিকর ঘটনা সংশ্লিষ্ট সন্দেহ - যাকে প্রভুর প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের পরিপন্থী বলে মনে করা হয়, বজ্ঞানিক ধারণাপ্রসতূ সন্দেহ- যা ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে পরিচিত এবং ধর্মীয় কোন

কোন বিধি- বিধান সম্পর্কে সন্দেহ, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সমাজিক বিধি- নিষেধ সম্পর্কে সন্দেহ।

কখনো কখনো দুই বা ততোধিক কারণ সমষ্টিগতভাবে সন্দেহ ও দ্বিধা - দ্বন্দ অথবা অস্বীকৃতিও নাস্তিকতার কারণ হয়ে থাকে । যেমন : কখনো কখনো একাধিক মানসিক জটিলতা ও অসংগতি সন্দেহ সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং 'সন্দিগ্ধ ' নামক মানসিক রোগের সৃষ্টি–করে, যার ফলশ্রুতিতে কোন প্রকার যুক্তি- প্রমাণেই সে তুষ্ট হয় না । যেমন : সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি, তার কৃতকর্মের সঠিকতা সম্পর্কে কখনই নিশ্চিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ দশ দশকবারও যদি পানিতে হাত ধৌত করে তারপরও সে নিশ্চিত হতে পারে না যে, পবিত্র হয়েছে কিনা - যদিও একবার ধৌত করাই পবিত্রতার জন্যে যথেষ্ট ছিল এবং ততোধিকবার অপরিহার্য ছিলনা ।

বিচ্যুতির নির্বাহকসমূহের বিরুদ্ধে সং াম

বিচ্যুতির নির্বাহক ও কারণসমূহের বিভিন্নতাকে বিবেচনা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এদের প্রতিটির প্রতিকারের জন্যে স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও শর্তের প্রয়োজন। যেমন : মানসিক ও আচরণগত কারণকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এবং আসন্ন ক্ষতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিকার করতে হবে; যেমনটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠে দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব ও এ ব্যাপারে উদাসীনতার ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

অনুরূপ সামাজিক অপকর্মের প্রভাবকে প্রতিরোধ (এ ধরনের ঘটনার উৎপত্তির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি) করতে হলে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ত্রুটিসমূহকে ধর্ম থেকে পৃথক করতে হবে। মানসিক ও সামাজিক কারণের প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে ন্যূনতম এ লাভটুকু হবে যে, ব্যক্তি অবচেতনভাবে হলেও এ নির্বাহক দ্বারা স্বল্পমাত্রায় প্রভাবিত হবে ।

তদনুরূপ চিন্তাগত কারণের অপপ্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষকরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে সঠিক বিশ্বাসকে পৃথক করতে হবে এবং দ্বীনের বিশ্বাসসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অযৌক্তিক ও দুর্বল প্রমাণের অবতারণা থেকে বিরত

থাকতে হবে। একইভাবে সুস্পষ্টরূপে দেখাতে হবে যে, প্রমাণের দুর্বলতা, দাবিকৃত বিষয়ের দুর্বলতা নয়।

এটা স্পষ্ট যে, বিচ্যুতির সকল কারণ এবং তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা (এ বইয়ের ক্ষুদ্র কলেবরে) যথোপযুক্ত নয়। ফলে শুধুমাত্র নাস্তিক্যপ্রবণতার চিন্তাগত কারণ ও এতদ সংশ্লিষ্ট অনুপপত্তিগুলোর উত্তর দানেই তুষ্ট থাকব ।

১৩তম পাঠ

কয়েকটি ভুল ধারণার অপনোদন

ইি য় া নয় এমন অস্তিত্বে বিশ্বাস

খোদা পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হল যে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য নয় এমন অস্তিত্বময়ের অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

এ ধরনের ভুল ধারণা সরল চিন্তার ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে পরিলক্ষিত হয়। তাদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বস্তুর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। তবে এমন সকল চিন্তাবিদও খুজে পাওয়া যায়, যারা তাদের চিন্তার ভিতকে ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন অথবা অন্ততঃপক্ষে সন্দেহাতীতরূপে শনাক্তকরণের উপযুক্ত নয় বলে মনে করেছেন।

এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে অর্জিত হয় এবং আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুগত বিষয়কে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুভব করে থাকে। ফলে যেমনি করে আশা করা যায় না যে, চোখ শব্দ শুনবে ও কর্ণ রং সমূহকে দেখবে, তেমনি এটাও আশা করা উচিৎ নয় যে, আমাদের সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়সমূহও সকল প্রকার অস্তিত্বকেই অনুভব করতে পারবে।

কারণ প্রথমত : বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের মধ্যেও এমন কিছু অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যেমন : আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অতি বেগুনী রি , র ন- রি , ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গকে দেখতে অক্ষম ।

দ্বিতীয়ত : এমন অনেক বাস্তবতা বিদ্যমান যেগুলোকে আমরা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত উপায়ে অনুভব করে থাকি এবং সন্দেহাতীত ভাবেই এগুলোকে আমরা বিশ্বাস করি - যদিও ঐগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। যেমন : আমরা ভয়, ভালবাসা অথবা স্বীয় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত আছি এবং

সন্দেহাতীতভাবে ঐগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করি - যদিও এ আত্মিক বিষয়গুলো আত্মার মতই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভবযোগ্য নয়। এমন কি স্বয়ং অনুভুতিও অবস্তগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্ভূত বিষয়।

অতএব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন বিষয় অনুভত না হওয়ার অর্থই এটা নয় যে, এর অস্তিত্ব নেই। বরং এ ধরনের কোন বিষয়ের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্ব) অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ক্ষে ভীতি ও অজ্ঞতার ভূমিকা

অপর একটি ভুল ধারণা, যা কোন কোন সমাজতান্ত্রিকের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হল এই যে, খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসসমূহ বিপদের প্রভাব বিশেষকরে, ভূমিকম্প, ব পাত ইত্যাদি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বীয় মানসিক শান্তির জন্যে খোদা নামক এক কাল্পনিক অস্তিত্বকে (العياذ بالله) সৃষ্টি করেছে এবং তার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছে। সুতরাং এ ধারণামতে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের উৎপত্তির কারণ এবং ঐগুলো থেকে নিরাপদে থাকতে পারার পদ্ধতি যতবেশী আবিস্কৃত হবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসও ততটা দুর্বলতর হতে থাকবে ।

মার্কসবাদিরা আরও বাগাড়ম্বরপূর্ণতা সহকারে স্বীয় পুস্তকসমূহে এ বিষয়টিকে সমাজতন্ত্র—বিজ্ঞানের অর্জিত বিষয় বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং মূর্খ ব্যক্তিদেরকে প্রতারণা করার জন্যে এটি একটি কৌশলমাত্র বলে মনে করে থাকেন ।

উত্তরে বলা উচিৎ

প্রথমতঃ এ ভুলধারণার উৎস হল কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদের অনুমান এবং এর সপক্ষে যথোপযুক্ত কোন তাত্ত্বিক যুক্তি নেই ।

দ্বিতীয়তঃ অধুনা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই, যারা প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সম্পর্কে অন্য সকলের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন ও আছেন এবং এমতাবস্থায় খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহাতীত ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং করছেন।[১৫] অতএব খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস যে, ভীতি ও অজ্ঞতারই ফল, এমনটি হতে পারে না ।

তৃতীয়তঃ কোন কোন প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে উৎসারিত ভীতি ও তাদের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতাই যদি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কারণ হয়েও থাকে, তথাপি তার অর্থ এ নয় যে, খোদাভীতি ও অজ্ঞতার সৃষ্টি।

এমন অনেক মানসিক প্রবণতা আছে, যেমন : সৌন্দর্যপ্রিয়তা, খ্যাতি লাভেচ্ছা ইত্যাদি, যা তাত্ত্বিক, প্রকৌশলিক ও দার্শনিক গবেষণার কারণ হয়ে থাকে । অথচ তা ঐ গুলোর বিশ্বস্ততাকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

চতুর্থতঃ যদি কেউ খোদাকে অজ্ঞাত কারণবিশিষ্ট বিষয়সমূহের অস্তিত্বদাতা হিসেবে শনাক্ত করে থাকেন এবং ঐগুলোর প্রাকৃতিক কারণ আবিস্কৃত হওয়ার পর যদি তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে তবে এটাকে তাদের বিশ্বাসেরই দুর্বলতা বলে মনে করতে হবে, যা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসের অবৈধতার প্রমাণ নয় । কারণ প্রকৃতপক্ষে জাগতিক বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে খোদার কারণত্ব, প্রাকৃতিক কারণের মত নয় ও তাদের সামন্তরিক কোন কারণও নয় । বরং এ কারণত্ব সকল কারণের উর্ধ্বে ও সমুদ্বয় বস্তুগত এবং অবস্তুগত কারণের উলম্বে অবস্থান করে । সুতরাং প্রাকৃতিক কারণের শনাক্তকরণ বা না করণ, একে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব ফেলে না ।

কার্যকারণবিধি কি একটি সার্বিক বিধি ?

অপর একটি ভুলধারণা, যা কোন কোন পাশ্চত্য চিন্তাবিদ উল্লেখ করেছেন তা হল : যদি কার্যকারণ বিধির সার্বিকতা থেকে থাকে তবে খোদার জন্যেও কোন কারণকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। অথচ মহান আল্লাহ হলেন প্রারম্ভিক কারণ, যার অস্তিত্ব কোন কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। অতএব কারণবিহীন খোদাকে স্বীকার করার অর্থ হল কার্যকারণ বিধির পরিপন্থি এবং এ বিধির সার্বজনীনতার ব্যতিক্রম কোন বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান । অপরপক্ষে যদি এ বিধির সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করি, তবে অনিবার্য অস্তিত্বকে প্রমাণের জন্যে এ বিধিকে প্রয়োগ করতে পারব না । কারণ, হয়ত কেউ বলতে পারেন যে, বস্তুমূল অথবা শক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং কোন কারণের সাহায্য ব্যতিরেকেই অস্তিত্বে এসেছে। অতঃপর এর পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমেই অন্য সকল বিষয়বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে ।

এ ভুলধারণাটি (যেমনটি ৭ম পাঠে বর্ণিত হয়েছে) কার্যকারণ বিধির অপব্যাখ্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ চিন্তা করেছেন যে, উল্লেখিত বিধিটির প্রকৃত ভাবার্থ হল 'সকল কিছুই কারণের উপর নির্ভরশীল ' । অথচ এর সঠিক ব্যাখ্যা হল 'প্রতিটি সম্ভাব্য অস্তিত্ব বা নির্ভরশীল অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল ' । এ বিধিটি এমন এক বিধি, যা সার্বজনীন ও ব্যতিক্রমতা বর্জিত।

আবার যদি মনে করা হয় যে, বস্তুমূল ও শক্তি কোন কারণ ব্যতীতই অস্তিত্বে এসেছে এবং তার বিবর্তনেই অন্য সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে; তাহলে তার জন্যে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব বলে আশা রাখি ।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সং হ

অপর একটি ভুলধারণা হল এই যে, বিশ্ব ও মানুষের জন্যে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস, আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ের সাথে সাম স্যপূর্ণ নয় । যেমন : রসায়নে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তু ও শক্তির মোট পরিমাণ সর্বদা ব এবং কোন কিছুই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসেনা। অনুরূপ কোন অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হয়ে যায় না। অথচ খোদার উপাসকগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদা সৃষ্ট বিষয়সমূহকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন ।

অনুরূপ জীববিজ্ঞানে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, জীবন্ত অস্তিত্ব নির্জীব অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে বিবর্তন ও বিকাশের মাধ্যমে মানবীয় রূপ লাভ করেছে । অথচ খোদার উপাসকগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদা তাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন ।

উত্তরে বলতে হবে

প্রথমতঃ বস্তু ও শক্তির নিত্যতাসূত্র হল, একটি তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি যা শুধুমাত্র পরীক্ষা- নিরীক্ষার উপযোগী বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত

দার্শনিক বিষয়টির সমাধান করা সম্ভব নয়। যথা : পাদার্থ এবং শক্তি কি অনাদি ও অনন্ত হতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ মোট পদার্থ ও শক্তির পরিমাণ ব ও চিরন্তন হওয়ার অর্থ,সৃষ্টিকর্তার উপর অনির্ভরশীলতা (সৃষ্টির জন্যে) নয়। বরং পৃথিবীর বয়ঃসীমা যত দীর্ঘতর হবে,সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার নির্ভরশীলতাও ততবেশী হবে। কারণ কার্যের (Effect) কারণের (Cause) উপর নির্ভরশীলতার মানদণ্ড হল তার (কার্যের) সম্ভাব্যতা ও সত্তাগত নির্ভরশীলতা -সৃষ্টি ও কালের সীমাবদ্ধতায় নয়। অন্য কথায় : পদার্থ ও শক্তি হল বিশ্বের বস্তুগত কারণ,কর্তকারণ নয় এবং তারাও স্বয়ং কর্তকারণের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত : পদার্থ ও শক্তির পরিমাণ ব হওয়ার অর্থ, নতুন কোন সৃষ্টির আবির্ভাব ও হ্রাস- বৃদ্ধির ব্যতিক্রম নয়। অপরপক্ষে আত্মা (روح) , জীবন (حيات) চেতনা (شعور) ও প্রত্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলো পদার্থ ও শক্তির মত কোন বিষয় নয় যে, তাদের হ্রাস- বৃদ্ধির ফলে পদার্থ ওশক্তির নিত্যতা সূত্রের পরিপন্থী কোন ঘটনা ঘটবে।

চতূর্থত : বিবর্তনের ধারণাটি বজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখনো যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। বরং অধিকাংশ বিজ্ঞ - মনীষী কর্তৃক পরিত্যাজ্যও হয়েছে। এ ধারণাটির সাথে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন বিরোধ নেই । সর্বোচ্চ হলেও তা শুধুমাত্র জীবন্ত অস্তিত্বসমূহের মধ্যে একপ্রকার সহায়ক কারণত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে - অস্তিত্বদাতা প্রভুর সাথে অস্তিত্বময়ের সম্পর্ককে নিষেধ করে না । আর এর প্রমাণ হল এই যে, এ ধারণারই অনেক সমর্থক, বিশ্ব ও মানুষের জন্যে এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করতেন এবং করেন ।

১৪তম পাঠ

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি এবং এর ত্রুটি নির্দেশ

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিসমূহ

বস্তগত বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে :

প্রথমতঃ অস্তিত্ব হল বস্তু ও বস্তসম্বন্ধীয় বিষয়ের সমান । ঐগুলোকেই অস্তিত্বশীল বলা যাবে, যেগুলো হল বস্তু এবং যারা ত্রিমাত্রিক (দর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট) ও যাদের আয়তন আছে; অথবা যারা বস্তগত বশিষ্ট্যের অধিকারী বলে পরিগণিত। স্বভাবতঃই বস্তু স্বয়ং নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিকারী যা বিভাজনযোগ্য। এ মূলনীতির ভিত্তিতে অবস্তগত ও অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্ব হিসেবে খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় ।

দ্বিতীয়তঃ বস্তু হল অনদি ও অনন্ত এবং অসৃষ্ট অস্তিত্ব যা কোন কারণের উপর নির্ভরশীল নয় । অর্থাৎ দার্শনিক পরিভাষায় আমরা যাকে বলি অনিবার্য অস্তিত্ব ।

তৃতীয়তঃ বিশ্বের জন্যে কোন চূড়ান্ত কারণ বা উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করা যায় না। কারণ এমন কোন সচেতন ও প্রত্যয়ী কর্তা নেই, যার প্রতি কোন উদ্দেশ্যকে আরোপ করা যাবে ।

চতূর্থতঃ বিশ্বে বিদ্যমান সৃষ্টিকুল (বস্তমল নয়) বস্তকণার গতির ফলে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রবর্তী সৃষ্টিসমূহকে উত্তরবর্তী সৃষ্টিসমূহের জন্যে একপ্রকার শর্ত ও সহায়ক কারণরূপে মনে করা যেতে পারে এবং বস্তগত বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একপ্রকার প্রাকৃতিক কর্তৃত্বকে মেনে নেয়া যায়। যেমন : বৃক্ষকে ফলের জন্যে প্রাকৃতিক কর্তা বলা যায়। অনুরূপ বস্তুগত ও রাসায়নিক বিষয়সমূহও নিজ নিজ নির্বাহকসমূহের সাথে সম্পর্ক যুক্ত । কিন্তু কোন সৃষ্ট বিষয়ই সৃষ্টিকর্তা বা অস্তিত্বদাতা কর্তার উপর নির্ভরশীল নয় ।

উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের সাথে অপর একটি মূলনীতিকে পঞ্চম মূলনীতি রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে, যা পরিচিতি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে অপর সকল মূলনীতির শীর্ষে অবস্থান করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

একমাত্র সে সকল পরিচিতিই গ্রহণযোগ্য, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা শুধুমাত্র বস্তু ও বস্তগত বিষয়কেই প্রতিপাদন করে সেহেতু অন্য কোন কিছুরই গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারেনা।

কিন্তু এ মূলনীতির অসারতা পূর্ববর্তী পাঠে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং নতুন করে একে খণ্ডনের প্রয়োজন নেই। ফলে এখানে আমরা অন্যান্য মূলনীতিসমূহের সমালোচনায় মনোনিবেশ করব ।

প্রথম মূলনীতির পর্যালোচনা

এ মূলনীতিটি, যা বস্তগত বিশ্বদৃষ্টির মৌলিকতম মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত তা প্রকৃতপক্ষে নিরর্থক ও অযৌক্তিক দাবি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশেষ করে বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার মত কোন প্রমাণই উপস্থাপন করতে পারবে না। কারণ এটা স্পষ্ট যে, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই স্বীয় বস্তু ও বস্তগত পরিসীমাকে অতিক্রম করে, কোন কিছুর ব্যাপারে মন্তব্য অথবা কোন কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার যুক্তিতে সর্বোচ্চ যা বলা যাবে, তা হল এই যে, এর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার) ভিত্তিতে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে প্রমাণ করা যাবে না। অতএব কমপক্ষে তার (অতিপ্রকৃতিকে) অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে মেনে নেয়া উচিৎ।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, মানুষ এমন অনেক অবস্তগত বিষয়কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করে থাকে, যেগুলো বস্তু বা বস্তগত কোন বশিষ্ট্যের অধিকারি নয় । যেমন : আত্মাকে (روح) মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করে । অনুরূপ নির্বস্তুক বিষয়ের (امور مجرد) স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শনের বিভিন্ন পুস্তকে সংরক্ষিত আছে। নির্বস্তুক আত্মার অস্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে সত্য স্বপ্নসমূহ, যোগীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, [১৬] নবী- রাসুল ও

ওলীগণের (আলাইহিমু ছালাম) বিভিন্ন মো ’ জেযা ও কিয়ামতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর বস্তগত না হওয়ার স্বপক্ষে, যে সকল দলিল, প্রমাণের অবতারণা হয়েছে তা- ই এ মূলনীতিটির অসারতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা

এ মূলনীতিতে বস্তর অনাদি ও অনন্ত হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, বস্তু হল অসৃষ্ট। কিন্তু,

প্রথমতঃ বস্তুর অনাদি ও অনন্ত হওয়া, বজ্ঞানিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিপাদনযোগ্য নয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই স্থান ও কালের দৃষ্টিতে বিশ্বের অনন্ত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে পারবে না ।

দ্বিতীয়তঃ বস্তকে অনাদি মনে করলেও, তার পারস্পরিক অর্থ এ নয় যে, তা সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন : কোন যান্ত্রিক গতির অনাদি হওয়ার কথা কল্পনা করার পারস্পরিক অর্থ হল, এক অনাদি উদ্দীপক শক্তিকে কল্পনা করা - উদ্দীপক শক্তির উপর এর অনির্ভরশীলতা নয়।

এ ছাড়া বস্তর অসৃষ্ট হওয়ার অর্থ হল, এর অনিবার্য অস্তিত্ব হওয়া । কিন্তু অষ্টম পাঠে আমরা প্রমাণ করেছি যে, বস্তর পক্ষে অনিবার্য অস্তিত্ব হওয়া অসম্ভব।

তৃতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা

তৃতীয় মূলনীতিটি অস্বীকার করে যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তা হতে স্বভাবতঃই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির প্রকাশ পায়। তাই প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার মাধ্যমে যুগপৎ এ নীতিটির অসারতাও প্রমাণিত হয়।

এ ছাড়া প্রশ্ন আসে যে, কিরূপে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারি কোন মানুষ মানব তরীকৃত কোন কিছুর পর্যবেক্ষণে তরীকারকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে, অথচ এক বিস্ময়কর সুবিন্যস্ত বিশ্বব্রম্মাণ্ড ও তাতে বিদ্যমান বিভিন্ন বিষয়বস্তর পারস্পরিক বন্ধন ও অগণিত কল্যাণময় সৃষ্টিকে অবলোকন করেও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবগত থাকবে ?

চতুর্থ মূলনীতির পর্যালোচনা

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির চতুর্থ মূলনীতিটি হল কারণত্বকে শুধুমাত্র বস্তুগত সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, যা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সমস্যাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ হল :

প্রথমতঃ এ মূলনীতি অনুসারে কখনোই কোন নব অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটা উচিৎ না। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা বিশেষ করে মানব ও প্রাণীজগতে নব নব অস্তিত্বের সংযোজন লক্ষ্য করছি । এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল জীবন, চেতনা, অনুভূতি, আবেগ, সৃজনশীলতা ও প্রত্যয়। বস্তুবাদীরা বলেন, উল্লেখিত বিষয়গুলোও বস্তুগত বশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরে বলব :

প্রথমতঃ উল্লেখিত বিষয়গুলো খণ্ডনযোগ্য নয়। অথচ বস্তু ও বস্তুগত বিষয়গুলো হল খণ্ডন ও বিভাজনযোগ্য এবং আকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলো এ বশিষ্ট্যের অধিকারী নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়গুলো যেগুলোকে 'বস্তুগত বশিষ্ট্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে এগুলো কোন নির্জীব বস্তুতে বিদ্যমান ছিলনা । অন্য কথায় : কোন এক সময় বস্তু এগুলোর অভাবে ছিল এবং পরবর্তীতে এ গুলোর অধিকারী হয়েছে । অতএব বস্তুগত বশিষ্ট্য বলে পরিচিত এ বিষয়গুলোকে অস্তিত্বে আসার জন্যে এমন এক অস্তিত্বদানকারীর উপর নির্ভর করতে হয়, যে এগুলোকে অস্তিত্বদান করে। আর তা- ই হল সৃষ্টিকারী বা অস্তিত্বদাতা কারণ ।

এ মতবাদটির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল যে, এ নীতি অনুসারে বিশ্বের সকল কিছু বাধ্যতামূলক হতে হবে । কারণ বস্তুর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় নির্বাচন ও– স্বাধীনতার কোন স্থান নেই।

স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যতিক্রম, যার পারস্পরিক অর্থ হল, যে কোন প্রকার দায়িত্ব- পরায়ণতা এবং চারিত্রিক ও আত্মিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা। আর দায়িত্ব পরায়ণতা

ও মূল্যবোধসমূহকে অস্বীকার করা যে, মানবিক জীবন ব্যবস্থার জন্যে কতটা হুমকিস্বরূপ তা বলাই বাহুল্য ।

সর্বোপরি বস্তু অনিবার্য অস্তিত্ব হতে পারে না, (ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে) এ যুক্তির আলোকে বলতে হয়, কোন এক কারণকে জাগতিক বিষয়সমূহের জন্যে বিবেচনা করতে হবে এবং এ ধরনের কোন কারণ প্রাকৃতিক বা সহায়ক কারণের মত হবে না। কারণ এ ধরনের শৃঙ্খলা বা পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয়সমূহের পরস্পরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সমগ্রবস্তু স্বীয় কারণের সাথে এ ধরনের সম্পর্ক (অর্থাৎ একটি অপরটির কারণ) বজায় রাখতে পারবে না। অতএব যে কারণ বস্তুকে অস্তিত্বে এনেছে তা হল সৃষ্টিকারী কারণ - যা অতি বস্তুগত বিষয়।

১৫তম পাঠ

দ্বা ক বস্তবাদ ও তার ত্রুটি নির্দেশ

যা ি ক বস্তুবাদ ও দ্বা ক বস্তুবাদ

বস্তবাদ একাধিক শাখায় বিভক্ত। এদের প্রতিটিই বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করে। নবযুগের প্রারম্ভিক লগ্নে বস্তবাদীরা নিউটনের পদার্থ সম্পর্কীয় মতবাদের প্রয়োগে জাগতিক যাবতীয় সৃষ্টিসমূহকে যান্ত্রিক গতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারা প্রতিটি গতি (বা পরিবর্তনকেই) কোন বিশেষ গতিশক্তির ফল বলে মনে করেছেন যা বাইরে থেকে গতিশীল (পরিবর্তনশীল) বস্ততে প্রবেশ করে । অন্য কথায় : তারা বিশ্বব্রম্মাণ্ডকে এমন একটি বৃহৎ যানবাহনের সাথে তুলনা করেছেন যে, গতিশক্তি তার এক অংশ থেকে অন্য অংশে পরিচালিত হয় যার ফলে এ বৃহৎ যানবাহনটি গতিশীল হয়ে থাকে।

'যান্ত্রিক বস্তবাদ ' বলে পরিচিত এ মতবাদটির অনেক দুর্বলতা বিদ্যমান যেগুলো প্রতিপক্ষের সমালোচনার বিষয়বস্ততে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য একটি হল : যদি সকল প্রকার গতিই বাহ্যিক কোন শক্তির ফল হয়ে থাকে তবে প্রারম্ভিক বস্তর জন্যেও কোন শক্তিকে বিবেচনা করতে হবে, যা বাইরে থেকে তাতে প্রবেশ করেছে। আর এর অবিচ্ছেদ্য অর্থ হল কোন অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া, যা ন্যূনতম পক্ষে বস্তজগতের প্রারম্ভিক গতির উৎস হয়ে থাকবে ।

অপরটি হল : শুধুমাত্র ঘুর্ণনগতি ও স্থানান্তরিক গতিকেই যান্ত্রিক গতিশক্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথচ বিশ্বের সকল বিষয়কে কেবলমাত্র স্থানান্তরিতগতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করা যায় না। সুতরাং এতভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের উৎপত্তির জন্যে অপর এক কারণ ও নির্বাহীকে বিবেচনা করা অপরিহার্য ।

এ অনুপপত্তিসমূহের উত্তরদানে যান্ত্রিক বস্তবাদের অক্ষমতা,বস্তবাদীদেরকে জগতিক বিভিন্ন রূপান্তরের ব্যাখ্যার জন্যে অপর এক কারণের দারস্থ হতে বাধ্য করে এবং ন্যূনতম পক্ষে তারা কোন কোন গতিকে স্বয়ংক্রিয়তার ভিত্তিতে অর্থাৎ (Dynamically) ব্যাখ্যা করতে,বস্তুর জন্যে একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় আন্দোলনকে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক বস্তবাদের পুরোধাগণ (মার্কস ও এ্যাংগেল্স) হেগেলের দার্শনিক ধারণার ভিত্তিতে গতির নির্বাহককে বস্তুর আভ্যন্তরীণ বিরোধরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । তারা স্বীয় মতবাদের ব্যাখ্যার জন্যে,বস্তর অবিনাশিতাবাদ ও অসৃষ্ট- নীতি সার্বজনীন গতি এবং সৃষ্ট বিষয়সমূহের পারস্পরিক প্রভাবের মূলনীতিকে গ্রহণ করার পাশাপাশি নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক বিষয়কে বর্ণনা করেছেন :

১। আভ্যন্তরীণ বপরীত্যনীতি।

২। দবাৎনীতি বা সংখ্যাবাচক (کمی) রূপান্তরের গুণবাচক রূপান্তরে পরিবর্তন।

৩। বিপ্রতীপদ্বয়ের বিবর্তননীতি বা প্রকৃতির বিকাশনীতি।

আমরা এখানে উল্লেখিত নীতিত্রয়ের প্রতিটির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করব এবং পরিশেষে তাদের অসারতা প্রমাণে প্রয়াসী হব।

বৈপরীত্য নীতি:

দ্বান্দ্বিক বস্তবাদ বিশ্বাস করে যে,সকল যৌগই দু'টি বিপ্রতীপ (Thesis Ges Anti-thesis) নিয়ে গঠিত। এ বিপ্রতীপদ্বয়ের বপরীত্যই বস্তর গতি ও রূপান্তরের কারণ । যখনই Anti-thesis বিজয়ী হয় তখনই নতুন এক বস্ত,যা তাদের Synthesis বলে পরিগণিত,তা অস্তিত্ব লাভকরে থাকে। যেমন : মুরগীর ডিমে (Thesis) শুক্রাণু (Anti-thesis) বিদ্যমান,যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং খাদ্যোপাদনসমুহকে নিজের অভ্যন্তরে হজম করে;অতঃপর মুরগীর বাচ্চা ঐগুলোর Synthesis হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে।

বদ্যুতিক ধনাত্বকতা ও ঋণাত্বকতা হল পদার্থের আভ্যন্তরীণ বপরীত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি যোজন- বিয়োজন, প্রাথমিক পর্যায়ের গাণিতিক বপরীত্য এবং ডিফারেন্সিয়েশন ও ইণ্টিগ্র্যাশন উচ্চপর্যায়ের গাণিতিক বপরীত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে ।
এ বিষয়টি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে কর্মজীবি শ্রেণী হল পুঁজিবাদীদের Anti -thesis যা প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং পর্যায়ক্রমে পুঁজিবাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের Synthesis হিসেবে সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) ও সাম্যবাদী (Communistic) সমাজ রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।
মার্কসবাদের প্রবক্তার বলেন যে, এ বপরীত্য নীতিটি ম্যাটাফিজিক্যাল ধারণাকে (পারস্পরিক বপরীত্যের অসম্ভাব্যতা) প্রত্যাখ্যান করে ।

সমালোচনা :
প্রারম্ভেই স্মরণযোগ্য যে, দু'টি বস্তুগত অস্তিত্ব যদি পরস্পর এমনভাবে অবস্থান করে যে, তাদের একটি অপরটিকে দুর্বল করে ফেলে অথবা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে স্বীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে; তবে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যেমনটি পানি ও আগুনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু,
প্রথমতঃ এ ব্যাপারটি সার্বজনীন নয় এবং একে বিশ্বের সকল ঘটনার জন্যে কোন সূত্র হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কারণ এর ব্যতিক্রম এমন শত- সহস্র ঘটনা এ বিশ্বে বিদ্যমান ।
দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বস্তুতে প্রাপ্ত এ ধরনের বপরীত্যের সাথে যুক্তি- বিজ্ঞান ও পরাপ্রাকৃতিক দর্শনে বর্ণিত অসম্ভাব্যতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ অসম্ভব বলে যাকে গণনা করা হয়েছে, তা হল একই বিষয়ে পরস্পর বিপ্রতীপের সমাবেশ, (اجتماع الضدين فى موضوع واحد) । উপরোল্লিখিত উদাহরণসমূহের কোনটিতেই বিষয়বস্তু একক নয়। আর মার্কসবাদীদের হাস্যকর উদাহরণের কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না। যেমন : যোজন ও বিয়োজন অথবা ডিফারেন্সিয়েশন ও

ইণ্টিগ্রেশনের সমাবেশ ইত্যাদি, অথবা পুঁজিবাদী সমাজে কর্মজীবি শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীকরণ ।

তৃতীয়তঃ যদি সকল কিছুই দু'টি বিপ্রতীপের সমন্বয়ে অস্তিত্বে এসে থাকে,তবে প্রতিটি Thesis এবং Anti -thesis- এর জন্যেও অপর একটি সমন্বয়কে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এগুলোও দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। ফলে বর্ণিত নীতি অনুসারে এরাও দু'টি বিপ্রতীপের সমন্বয় হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ফলশ্রুতিতে,প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বই অসীম সংখ্যক বিপ্রতীপের সমন্বয় হতে হবে।

অপরদিকে যান্ত্রিক বস্তবাদের দুর্বলতাকে দূরীকরণের নিমিত্তে, আভ্যন্তরীণ বপরীত্যকে যে গতি বা বিবর্তনের মূলনির্বাহক হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা করেছেন, তা ন্যূনতমপক্ষে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল, এ ধারণার স্বপক্ষে কোন বজ্ঞানিক যুক্তিরই অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া বাহ্যিক শক্তির প্রভাবে যে যান্ত্রিক গতির উৎপত্তি হয়, তা যে কোন অবস্থায়ই অনস্বীকার্য। নতুবা প্রশ্ন থেকে যায়, ফুটবলের গতিও কি তার আভ্যন্তরীণ বপরীত্যের ফলে সৃষ্ট বলতে হবে, না কি খেলোয়াড়ের পায়ের আঘাতে সৃষ্ট বলতে হবে !

দৈবাৎনীতি:

জগতের সকল পরিবর্তনই পর্যায়ক্রমে ও একক রেখায় সজ্জিত নয়। অধিকাংশ সময়ই নতুন এমন কোন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে, যা পূর্ববর্তী সকল সৃষ্টবিষয় থেকে স্বতন্ত্র এবং তাকে পূর্ববর্তী গতি বা পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্ণনা করা যায় না । এ ধারণার উপর ভিত্তি করে, মার্কসবাদীরা, দবাৎনীতি বা 'পরিমাণবাচক পরিবর্তনের গুণবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরের পথ ' নামক অপর একটি নীতির প্রবর্তন করেছেন। এ নীতিতে তারা বলেন : সাংখ্যিক পরিবর্তন যখন কোন এক বিশেষ বিন্দুতে পৌঁছে, তখন গুণগত বা প্রকরণগত পরিবর্তনের উদ্ভব হয়। যেমন : পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে, তখন পানি, বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। অনুরূপ প্রতিটি ধাতব পদার্থের জন্যেই নির্দিষ্ট গলনাংক বিদ্যমান এবং যখন

তাপমাত্রা ঐ গলনাংকে পৌঁছে উক্ত ধাতবপদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয় । মানব সমাজেও যখন বিরোধ বা মতপার্থক্যের তীব্রতা নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছে, তখন বিপ্লব অস্তিত্বে আসে ।

সমালোচনা:

প্রথমতঃ কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাবাচকতা, গুণবাচকতায় রূপান্তরিত হয় না। সর্বোপরি যা ঘটে তাহল কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উৎপত্তি নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচকতার শর্তাধীন । যেমন : পানির তাপমাত্রা বাস্পে পরিণত হয় না। বরং পানির বাস্পে পরিণত হওয়াটা পানিতে বিদ্যমান তাপমাত্রার পরিমাণের শর্তাধীন।

দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তনের জন্যে এ বাঞ্ছিত পরিমাণ, পর্যায়ক্রমিক পরিমাণগত বর্ধনের ফলে অর্জিত হওয়াটা অপরিহার্য নয়। বরং পূর্ববর্তী পরিমাণের হ্রাসের ফলে এ পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে । যেমন : বাস্পের পানিতে পরিবর্তীত হওয়াটা তাপমাত্রার হ্রাসের শর্তাধীন ।

তৃতীয়তঃ গুণগত পরিবর্তন সর্বদাই আকস্মিকভাবে ঘটে না । বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে। যেমন : মোম ও কাঁচের গলে যাওয়াটা পর্যায়ক্রমে ঘটে থাকে।

অতএব গ্রহণযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, প্রাকৃতিক কতকগুলি বিষয়ের বাস্তবায়নের জন্যে কোন বিশেষ পরিমাণের আবশ্যকতা রয়েছে। না, পরিমাণের গুণে পরিবর্তনের আবশ্যকতা আর না, পরিমাণের ক্রমশ বৃদ্ধির আবশ্যকতা রয়েছে এবং না, কোন গুণগত ও পরিমাণগত যাবতীয় পরিবর্তনের জন্যে অনুরূপ শর্তের সামগ্রীকতা আবশ্যক।

সুতরাং বিশ্বজগতে দবাৎ নীতি বা 'পরিমাণবাচক পরিবর্তনের গুণবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরের পথ ' নামক কোন নীতির অস্তিত্ব নেই।

বিপ্রতীপদ্বয়ের বিবর্তননীতি

এ নীতিটি 'না- বোধকের না- বোধক' নীতি বলে পরিচিত। কখনো কখনো একে প্রকৃতির বিবর্তন নীতিও বলা হয়ে থাকে। এ নীতির বক্তব্য হল : দ্বান্দ্বিকতার অসংখ্য রূপান্তরের ধারায় সর্বদা Thesis, Anti - thesis কর্তৃক অস্বীকৃত হয়ে থাকে। অনুরূপ Anti - thesis ও স্বয়ং Synthesis কর্তৃক অস্বীকৃত হয়। যেমন : বীজ,বৃক্ষকর্তৃক এবং তাও নতুন বীজসমূহ কর্তৃক অস্বীকৃত হয়। প্রাণ একক (نطفه) ডিম কর্তৃক এবং স্বয়ং ডিম বাচ্চা কর্তৃক অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সকল অনুজই,অগ্রজ অপেক্ষা পূর্ণতর। অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বিবর্তন- ধারা সর্বদা উন্নয়ন ও পূর্ণতার দিকে হয়ে থাকে। আর এ নীতির গুরুত্বও এখানেই সুপ্ত,যা রূপান্তর ধারাকে নির্দেশ করে এবং রূপান্তর ধারা উন্নয়ন ও পূর্ণতার দিকে বলে গুরুত্বারোপ করে।

সমালোচনা:

নিঃসন্দেহে প্রতিটি পরিবর্তন ও বিবর্তনেই পূর্ববর্তী অবস্থান ও অবস্থা বিলুপ্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন অবস্থা ও অবস্থানের সূত্রপাত ঘটে। যদি 'না- বোধকের না- বোধক ' নীতিকে উপরোল্লেখিত অর্থে বিবেচনা করি, তবে তা রূপান্তরের অবিচ্ছেদ্য বিষয়ের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এ নীতির যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং একে যে, গতি ও পূর্ণতার দিক- নির্দেশনা বলে মনে করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে বলতে হয় : বিশ্বের গতি ও রূপান্তর পূর্ণতার দিকে বলতে যদি এ অর্থকে বুঝায় যে, প্রতিটি নতুন বিষয়ই অপরিহার্যভাবে পূর্ববর্তী বিষয় অপেক্ষা পূর্ণতর তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । ইউরেনিয়াম যে, অতি বিচ্ছুরণের প্রভাবে সীসায় পরিণত হয় তাও কি আর পূর্ণতাপ্রাপ্তি বলে পরিগণিত হয় ? পানি যে, বাস্পে পরিণত হয় অথবা বাস্প যে পানিতে পরিবর্তিত হয়, তাতেও কি পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে ? বৃক্ষ ও লতা- পাতা যে, শুষ্ক হয়ে যায় এবং কোন প্রকার বীজ ও ফলই তাতে অবশিষ্ট না থাকে তা- ও কি তাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি?

অতএব শুধুমাত্র এটুকই গ্রহণযোগ্য যে, কোন কোন প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু গতি ও পরিবর্তনের ফলে পূর্ণতর হয়ে থাকে (সকল বিষয়ই নয়)। সুতরাং বিবর্তনকেও বিশ্বের সকল সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে একটি সার্বজনীন সূত্ররূপে গ্রহণ করা যায় না ।

পরিশেষে স্মরণ করব : এ সকল নীতিগুলো সার্বজনীনভাবে যদি গৃহীত ও স্বীকৃতও হয়ে থাকে, তারপরও প্রকৃতি বিজ্ঞানে প্রমাণিত সূত্রসমূহের মত শুধুমাত্র সৃষ্ট বিষয় বস্তর স্বরূপ উদঘাটন করতে পারত । কিন্তু, এমন কোন প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন নীতি ও সূত্রের অস্তিত্ব নেই যে, প্রমাণ করবে কোন বিষয় তার সৃষ্টিকর্তা বা অস্তিত্বদাতা কারণ ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে। যেমনি করে পূর্ববর্তী পাঠসমূহে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যেহেতু বস্তু ও বস্তুগত বিষয়সমূহ হল সম্ভাব্য অস্তিত্ব, সেহেতু কোন অনিবার্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল থাকা অপরিহার্য ।

১৬তম পাঠ

আল্লাহর একত্ব

ভূমিকা :

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে, বিশ্বসৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে –যিনি সর্বজ্ঞ, পরাক্রমশালী এবং বিশ্বের অস্তিত্বদানকারী, রক্ষক ও পরিচালক । এ ছাড়া সাম্প্রতিক পাঠসমূহে আমরা বস্তবাদী বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক তার বিভিন্ন সমস্যা ও ত্রুটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। ফলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তাবিহীন বিশ্বের ধারণা হল একটি অযৌক্তিক ধারণা এবং এর স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা নেই ।

এখন একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনার পালা এসেছে। এ পর্যায়ে আমরা অংশীবাদী ধারণার অসারতা প্রমাণ করার প্রয়াস পাব।

অংশীবাদী বিশ্বাস কিরূপে মানুষের মাঝে পত্তন এবং বিস্তার লাভ করেছিল, সে ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানীরা একাধিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন । কিন্তু ঐগুলোর কোনটির স্বপক্ষেই সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য কোন যুক্তি নেই ।

সম্ভবতঃ অংশীবাদ এবং একাধিক খোদার বিশ্বাসের প্রথম কারণ ছিল বিশ্ব- ব্রমাণ্ডের বচিত্র্যময় ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ । এ বচিত্র্যের পর্যবেক্ষণে মানুষের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রত্যেক প্রকারের ঘটনা, সংশ্লিষ্ট খোদার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে । যেমন : কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, শুভ ঘটনাগুলো হল কল্যাণকামী প্রভুর কর্ম এবং মন্দ ঘটনাগুলো হল অকল্যাণকামী প্রভুর কর্ম। আর এ ভাবেই বিশ্বের জন্যে দু'খোদার বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়েছিল।

অপরদিকে সূর্যা লোক, চন্দ্র ও তারকাসমূহ যে, পার্থিব ঘটনাবলীর উপর প্রভাব ফেলে, তার আলোকে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, বিশ্বের বিষয়বস্তর উপর ঐগুলোর এক প্রকার প্রভুত্ব বিদ্যমান ।

অথবা স্পৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খোদার প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে কল্পিত প্রভুদের মূর্তি তরী এবং তাদের উপাসনায় নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে স্বয়ং মূর্তিসমূহ স্বল্পবুদ্ধির জনসমষ্টির মাঝে মূখ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সকল জাতি এমনকি প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ কল্পনার ভিত্তিতে মূর্তি- পূজার জন্যে একাধিক ধর্মের প্রবর্তন করেছে - যাতে একদিকে যেমনি প্রভুভক্তির ফিতরাতগত প্রবণতাকে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে, তেমনি অপরদিকে, নিজেদের পাশবিক লোভ- লালসাকে পবিত্রতার রঙে রি ত করা যেতে পারে এবং তদনুরূপ এগুলোকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কলেবরে রূপ দেয়া যেতে পারে। আজোবধি উচ্ছৃংখল নৃত্য, মদ্যপ ও কামুক উৎসবসমূহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপে মূর্তিপজারীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

এ ছাড়া, স্বেচ্ছারী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার, প্রতিহিংসাপরায়ণ পাষণ্ডদের অভিলাষও সরলমনা জনসমষ্টির বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার কারণ হয়েছিল। এভাবে স্বীয় রাজত্ব ও ক্ষমতার সম্প্রসারণের জন্যে তারা অংশীবাদী ধ্যান- ধারণার প্রচার ও প্রসারে প্রয়াসী হয়েছিল এবং নিজেদের জন্যে এক প্রকার প্রভুত্বে বিশ্বাসী ছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দূবত্তদের উপাসনাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করেছে । মিশর, ভারত, চীন, পারস্য ইত্যাদি দেশে এর সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় ।

যাহোক অংশীবাদী ধর্মসমূহ, বিভিন্ন কারণ ও নির্বাহকের প্রভাবে, মানব সমাজে প্রথিত ও প্রচলিত হয়েছিল এবং ঐশীধর্ম ও একত্ববাদের ছায়ায় মানুষের প্রকৃত বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে নবীগণের (আঃ) প্রচেষ্টার এক বৃহত্তর অংশ জুড়ে স্থান পেয়েছিল অংশীবাদ ও অংশীবাদীদের বিরূদ্ধে সংগ্রাম। পবিত্র কোরানে পুনঃপৌনিকভাবে তাঁদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ।

অতএব অংশীবাদী বিশ্বাসের মূলভিত্তি, বিশ্বব্র¤মাণ্ডের কোন কোন ঘটনার জন্যে মহান প্রভু ভিন্ন অপর কোন অস্তিত্বের প্রতি প্রভুত্বের ধারণা থেকে রূপ লাভ করেছিল। তবে অংশীবাদীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বসৃষ্টি কর্তার একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সৃজনক্ষমতার একত্বকে স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রভুদের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন ।

তাদের ধারণানুসারে জগতের পরিচালনা ও রক্ষার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষভাবে (এ দ্বিতীয় শ্রেণীর) প্রভুদের ইচ্ছাধীন। তারা সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে বর্ণিত খোদাদের প্রভুরূপে নামকরণ করেছে। অর্থাৎ তিনি হলেন প্রভুদের প্রভু (رب الارباب)

কারো কারো মতে এ পরিচালক প্রভুরা হলেন ফেরেস্তাগণ । আরব অংশীবাদীরা এ ফেরেস্তাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করত । আবার কারো কারো মতে জ্বিন- পরীরা, কারো কারো মতে নক্ষত্র সমষ্টির আত্মারা অথবা প্রয়াত মানুষের আত্মারা কিংবা এক বিশেষ ধরনের অজ্ঞাত অস্তিত্ব হল এ পরিচালক প্রভুসকল।

দশম পাঠে আমরা ইঙ্গিত করেছিলাম যে, প্রকৃত সৃজনত্ব ও প্রতিপালনত্ব পরস্পর থেকে বিভাজনযোগ্য ও পৃথকীকরণযোগ্য নয় এবং আল্লাহর সৃজনত্বে বিশ্বাস (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কারো প্রতিপালনত্বের সাথে সাম স্য পূর্ণ নয়। যারা এ ধরনের স্ববিরোধিতাপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করতেন তারা প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত অবস্থাদ্বয়ের বপরীত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি এবং তাদের বিশ্বাসের বাতুলতা প্রমাণ করার জন্যে এ বপরীত্যের সুস্পষ্ট কারণই যথেষ্ট ।

খোদার একত্বকে প্রমাণ করার জন্যে একাধিক যুক্তির অবতারণা হয়েছে; যেগুলো কালামশাস্ত্রও দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমরা এখানে এমন একটি যুক্তি উপস্থাপন করব, যাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপালনত্বের একত্ববাদকে প্রতিপাদন করার পাশাপাশি, অংশীবাদী বিশ্বাসেরও অপনোদন হয়।

আল্লাহর একত্বের প্রমাণ

ধরা যাক বিশ্বের জন্যে দুই বা ততোধিক সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান। তাহলে তা নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহের ব্যতিক্রম হবে না : হয় বিশ্বের প্রতিটি বিষয়ই তাদের ফলশ্রুতি বা সৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে অথবা প্রতিটি শ্রেণীই কোন এক প্রভুর সৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে কিংবা সবকিছুই এক প্রভুর সৃষ্ট; তবে অন্যান্য খোদারা বিশ্বের পরিচালক ও তত্তাবধায়ক রূপে পরিগণিত হবে ।

কিন্তু ‘সকল সৃষ্টরই একাধিক সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান ’ এ ধারণাটি অসম্ভব। কারণ, দুই বা ততোধিক সৃষ্টিকর্তা (অস্তিত্বদাতা কারণ) কোন অস্তিত্বশীলকে সৃষ্টি করার অর্থ হল, তাদের প্রত্যেকেই একটি করে ‘অস্তিত্ব ’ ঐ অস্তিত্বশীলকে দান করা। যার ফলশ্রুতি হল, একটি অস্তিত্বশীলের জন্যে একাধিক অস্তিত্বের ধারণা। অথচ প্রত্যেক অস্তিত্বশীলই কেবলমাত্র একটি অস্তিত্বেরই অধিকারী। নতুবা তা একক অস্তিত্বশীল হতে পারে না ।

অপরদিকে প্রতিটি সৃষ্ট বিষয়ের অথবা ঐ শ্রেণীর সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে একজন করে সৃষ্টিকর্তা থাকার অপরিহার্য অর্থ হল : প্রত্যেক সৃষ্ট বিষয়ই স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল এবং কেবলমাত্র চূড়ান্ত নির্ভরশীলতা, যা স্বীয় সৃষ্টিকর্তায় পৌঁছে, তা ব্যতীত অপর কোন সৃষ্ট বিষয়ের তার কোন প্রয়োজন নেই। আর এ ধরনের নির্ভরশীলতা শুধুমাত্র স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অন্যকথায় : বিশ্বের একাধিক সৃষ্টিকর্তা থাকার অপরিহার্য অর্থ হল একাধিক ও পরস্পর বিরোধী বিন্যাস ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকা। অথচ সৃষ্টির আদি থেকেই বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ড একক বিন্যাস ব্যবস্থায় ও নিয়মানুবর্তিতায় পরিচালিত হচ্ছে। সমসাময়িক সৃষ্টিসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল এবং তারা পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলে। অনুরূপ পূর্ববর্তী সৃষ্টিসমূহের সাথে উত্তরবর্তী সৃষ্টিসমূহের যেমন সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি বিদ্যমান সৃষ্টিসমূহের সাথেও ভাবি সৃষ্টিসমূহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার সকল পূর্ববর্তী সৃষ্টিসমূহই উত্তরবর্তী সৃষ্টিসমূহের আবির্ভাবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

অতএব এ ধরনের কোন বিশ্ব, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সুসন্নিবেশিত এবং যা একক বিন্যাসব্যবস্থার অধীন পরিচালিত, তা কখনোই একাধিক অস্তিত্বদাতা কারণের ফলশ্রুতি হতে পারে না ।

অনুরূপ যদি ধারণা করা হয় যে, সকল প্রকার সৃষ্টির জন্যে একই সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান, কিন্তু তাদের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব অন্যান্যদের উপর ন্যস্ত, তবে তা- ও সঠিক হতে পারে না। কারণ সকল সৃষ্ট বিষয়ই, তার অস্তিত্বের জন্যে সার্বিকভাবে অস্তিত্বদাতা কারণের উপর

নির্ভরশীল- অপর কোন স্বাধীন অস্তিত্বেরই, তার উপর কোন অধিকার বা প্রভাব নেই। তবে কেবলমাত্র ঐ সকল প্রভাবই বিদ্যমান যা কোন এক কারণের কার্যসমূহের (معلومات) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তদুপরি সকল কিছুই অস্তিত্বদাতা কর্তার প্রভাব বলয়ে এবং আধিপত্যের আওতায় অবস্থান করে এবং তাঁরই সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট অনুমতিক্রমে সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। আর এ অবস্থায় বর্ণিত তত্তাবধায়কদের কেউই প্রকৃত রাব্ব (رب) হতে পারে না। কারণ রাব্বের (رب) স্বরূপ হল স্বীয় আধিপত্যের আওতায় স্বাধীনভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যদি মনে করা হয় যে, এ ধরনের প্রভাব ও আধিপত্য স্বাধীন নয়; বরং সকলেই সৃষ্টিকর্তার প্রতিপালনের অধীন এবং যে ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অর্পিত হয় সে ক্ষমতার আলোকে কার্যসম্পাদন করে থাকে। তবে এ ধরনের কোন প্রভুত্ব ও তত্তাবধানের ধারণা, প্রভুত্বের একত্ববাদের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। অনুরূপ যে সৃজনকর্ম আল্লাহর অনুমতিক্রমে সম্পাদিত হয় বলে মনে করা হয়, তা- ও সৃজনক্ষমতার একত্বের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। পবিত্র কোরান ও রেওয়ায়েতসমূহে এ ধরনের অনুচরিত ও পরাধীন সৃষ্টি ও তত্তাবধানের কথা আল্লাহর কোন কোন বান্দাগণের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন : হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে :

- আর যখন তুমি কাদামাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখীসদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত। (সূরা মায়িদাহ্ - ১১০)

অনুরূপ আরও বলা হয় : - শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। (সূরা নাযিয়াত- ৫)

উপসংহারে বলা যায়, বিশ্বের জন্যে একাধিক খোদার ধারণা, বস্তুগত কারণ ও সহায়ক কারণসমূহকে খোদার সাথে তুলনা করা থেকে রূপ লাভ করেছে এবং একক কার্যের জন্যে তাদের (কারণের) বহুত্বে কোন সমস্যা নেই। অপরদিকে অস্তিত্বদাতা কারণকে এ ধরনের কারণের সাদৃশ্য বলে কল্পনাই করা যায় না এবং কোন একক কার্যের জন্যই একাধিক অস্তিত্বদাতা কারণ বা প্রভু কিংবা স্বাধীন তত্তাবধায়কের ধরণা করা যায় না ।

অতএব এ ধরনের ভুল ধারণার অপসারণের জন্যে, একদিকে অস্তিত্বদাতা কারণের অর্থ ও এ ধরনের কারণত্বের বিশেষত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিতে হবে যাতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন একক কার্যের জন্যে এক ধরনের কারণত্বের বহুত্ব অসম্ভব। অপরদিকে বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডের সুশৃংখল বিন্যাসব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের সুশৃংখল বিন্যাসব্যবস্থা এশাধিক সৃষ্টিকর্তা অথবা এশাধিক স্বাধীন রাব্বের তত্তাবধানে হতে পারে না।

প্রসংগক্রমে স্পষ্ট হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কোন কোন বান্দার জন্যে সৃজন ক্ষমতা ও প্রতিপালনত্ব যদি স্বাধীন বা অনির্ভরশীল অর্থে না হয় তবে সুনির্ধারিত বিলায়াত একত্ববাদের সাথে কোন অসঙ্গতি সৃষ্টি করে না । যেমন : মহানবী (সঃ) ও পবিত্র ইমামগণের (আঃ) বিধিগত বিলয়াত(الولاية التشريعة) মহান আল্লাহর বিধিগত বিলায়াতের সাথে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি সৃষ্টি করেনা। কারণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই তা অনুমোদিত হয়েছে।

১৭তম পাঠ

তাওহীদের অর্থ কী ?

ভূমিকা :

তাওহীদ (توحيد) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা' বা একত্ববাদ। দর্শন, কালাম, আখলাক ও ইরফান বিশেষজ্ঞগণের ভাষায় "তাওহীদ" শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এ অর্থগুলোতে খোদার একত্ববাদকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো 'তাওহীদের প্রকারভেদ' অথবা 'তাওহীদের স্তরসমূহ শিরোনামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তবে এগুলোর সবকটি সম্পর্কে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের সাথে সাম স্যপূর্ণ নয়।

অতএব এখানে আমরা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধতর ও সাযুজ্যতর পরিভাষাগুলোর আলোচনা করে ইতুষ্ট থাকব।

১। বহুত্বের অস্বীকৃতি :

তাওহীদের সর্বপথম প্রসিদ্ধ পরিভাষাটি হল, খোদার একত্বে বিশ্বাস ও বহুত্বের অস্বীকৃতি। "তাওহীদ" প্রকাশ্য অংশীবাদের বিরুদ্ধে বা বিপরীতে অবস্থান নিয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক স্বাধীন খোদার প্রতি বিশ্বাস এরূপে যে, তাদের একের প্রতি অপরের কোন নির্ভরশীলতা নেই এ অংশীবাদী বিশ্বাসকেও তাওহীদ অস্বীকার করে।

২। যৌগিকতার অস্বীকৃতি :

তাওহীদের দ্বিতীয় পরিভাষাটি হল একত্বের বিশ্বাসার্থে সত্তার অবিভাজ্যতা বা প্রভুসত্তা, কার্যকরী ও সামর্থ্যগতভাবে অংশের সমষ্টি না হওয়া।

এ অর্থকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে না- বোধক গুণ বা সিফাতুসসালবিয়াহ্ (যৌগিকতার অস্বীকৃতি) রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে (যেমনটি দশম পাঠে আলোচনা করা হয়েছে)। কারণ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি

যৌগের ধারণা সম্পর্কে এবং প্রাসংগিকভাবে তার অস্বীকৃতির সাথে, অবিভাজ্যতার তাৎপর্য অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত ।

৩। প্রভুসত্তার সাথে অতিরিক্ত গুণাবলী সংযোজনের অস্বীকৃতি :

তাওহীদের তৃতীয় পরিভাষাটি প্রভুসত্তার সাথে তাঁর গুণসমূহের একাত্বতা এবং সত্তার সাথে অতিরিক্ত বা অর্জিত গুণাবলী সংযোজনের অস্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে- যাকে গুণগত একত্ব বলা হয়। তবে রেওয়ায়েতের ভাষায় একে 'গুণাবলীর পরিবর্জন ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাওহীদের এ পরিভাষাটি, যারা (যেমন : আশায়েরী সম্প্রদায়) খোদার গুণাবলীকে তাঁর সত্তাবহির্ভূত অতিরিক্ত বিষয় বলে মনে করেন এবং যারা 'অষ্টপ্রাচীনত্বের ' প্রবক্তা, তাদের বিপরীতে অবস্থান নেয় ।

গুণগত একত্ববাদের স্বপক্ষে যুক্তি হল : যদি আল্লাহর প্রতিটি গুণই স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তের (مصداق) অধিকারী হয়, তবে তা নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার ব্যতিক্রম নয় :

হয় ঐ গুণগুলোর দৃষ্টান্ত প্রভুসত্তার অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যার অপরিহার্য অর্থ হবে, প্রভুসত্তা হল এশাধিক অংশের সমষ্টি এবং ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, এ ধরণের কোন কিছু অসম্ভব অথবা ঐ গুণগুলোর দৃষ্টান্ত সত্তাবহির্ভূত বলে বিবেচিত হয় এবং এ অবস্থায়, হয় 'অনিবার্যঅস্তিত্ব ' ও 'সৃষ্টিকর্তার উপর অনির্ভরশীল ' বলে পরিগণিত হবে অথবা 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব ' ও 'সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল ' বলে পরিগণিত হবে।

কিন্তু গুণগুলোর অনিবার্য অস্তিত্ব হওয়ার অর্থ হবে, সত্তার একাধিকত্ব ও সুস্পষ্ট অংশীবাদ এবং কোন মুসলমানই এর দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। অপরদিকে গুণগুলোর 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব' হওয়ার অপরিহার্য অর্থ হল 'প্রভুসত্তা ' ঐ গুণগুলোর ঘাটতিতে থাকার ফলে ঐগুলোকে সৃষ্টি করতঃ সংশ্লিষ্ট গুণসমূহে গুণান্বিত হয়েছেন । যেমন : যদিও মহান আল্লাহ জীবনহীন তথাপি জীবন নামক এক অস্তিত্বকে সৃষ্টি করেন এবং তার মাধ্যমেই জীবন লাভ করেন। অনুরূপ জ্ঞান, ক্ষামতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই ধারণা রূপ পরিগ্রহ করে । অথচ 'অস্তিত্বদাতা কারণ ' সত্তাগতভাবে সৃষ্ট বিষয়ের পূর্ণতাসমূহের ঘাটতিতে থাকবে, এটা অসম্ভব।

সর্বাপেক্ষা লজ্জাজনক ব্যাপার হল এটা যে, স্বীয় সৃষ্ট বিষয়সমূহের ছায়ায় জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং অন্যান্য উৎকর্ষ গুণে গুণান্বিত হওয়া।

উপরোক্ত ধারণাগুলোর বর্জনের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রভুর গুণসমূহ প্রভুসত্তা ভিন্ন, পরস্পর স্বতন্ত্র অন্য কোন দৃষ্টান্তের (مصداق) অধিকারী নয়। বরং তাদের সকলেই এমন এক ভাবার্থ যে, (শুধুমাত্র) বুদ্ধিবৃত্তিই, প্রভুর একক, অবিভাজ্য, পবিত্র সত্তা থেকে পৃথক রূপে উপস্থাপন করে থাকে (কিন্তু বাস্তব জগতে তাদেরকে আলাদা করে ভাবা অসম্ভব)।

৪। ক্রিয়াগত একত্ববাদ :

তাওহীদের চতুর্থ পরিভাষাটি, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদগণের নিকট ক্রিয়াগত একত্ববাদ বলে পরিচিত। আর এর অর্থ হল : মহান আল্লাহ স্বীয় কর্ম সম্পাদনের জন্যে কারো উপর ও কোনকিছুর উপরই নির্ভরশীল নন এবং তিনি কোন ভাবেই কোন অস্তিত্বের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন।

এ বিষয়টি 'অস্তিত্বদাতা কারণের ' বিশেষত্বের আলোকে প্রমাণ করা যায়, যা সকল কার্যের (معلول) প্রতিষ্ঠাতা। কেননা এ ধরনের কারণের (অস্তিত্বদাতা কারণ) কার্যগুলো সমস্ত অস্তিত্বের জন্যে উক্ত কারণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দর্শনের ভাষায়, এ কার্যগুলো খোদার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ' এবং ঐ গুলোর কোন প্রকার স্বনির্ভরতা নেই ।

অন্যকথায় : যে কেউ যা কিছুরই অধিকারী হোক না কেন, তা তাঁরই নিকট থেকে এবং তাঁরই ক্ষমতার অধীন। তাঁরই রাজত্বের পরিমণ্ডলে, তাঁরই সুনির্ধারিত ও প্রকৃত মালিকানাধীন। অন্য সবার ক্ষমতা ও মালিকানা তাঁর ক্ষমতা ও মালিকানার উলম্বে ও নিম্নস্তরে অবস্থান করে এবং তারা খোদার ক্ষমতার পথে কোন প্রকার ক্লেশ সৃষ্টি করে না। যেমন : বান্দা উপার্জিত সম্পদের উপর যে বধ মালিকানা লাভ করে তা প্রভুর বধ মালিকানার উলম্বে অবস্থান করে।

العبد و ما فی یده کان لمولاه

'বান্দা ও যা কিছু তার নিকট আছে, সকলই প্রভুর জন্যে ' ।

অতএব মহান আল্লাহ এমন কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবেন, যারা তাদের সমগ্র অস্তিত্বের জন্যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তা কীরূপে সম্ভব ?

৫। স্বাধীন প্রভাব :

তাওহীদের পঞ্চম পরিভাষাটি হল 'স্বাধীন প্রভাব ' [১৭] অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট বিষয়াদি স্বীয় কর্মের ক্ষেত্রেও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। সৃষ্ট বিষয়াদির পরস্পরের মধ্যে যে প্রভাব ও কর্মতৎপরতা বিদ্যমান, তা আল্লাহরই অনুমতিক্রমে, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র যিনি অনির্ভরশীল ও স্বাধীনভাবে সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় এবং সকল কিছুর উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম, তিনি হলেন পবিত্র সত্তার অধিকারী মহান আল্লাহ। সকল কর্মতৎপরতা ও প্রভাব তাঁর কর্মতৎপরতা ও প্রভাবের উলমে^ অবস্থান করে এবং তাঁরই প্রভাবের প্রতিফলনে স্বীয় কর্মসম্পাদন করে।

আর এর ভিত্তিতেই পবিত্র কোরান প্রাকৃতিক নির্বাহকসমূহ এবং অপ্রাকৃতিক নির্বাহকসমূহের (যেমন : ফেরেস্তা, জ্বীন ও মানুষ) সকল কীর্তিকে খোদার প্রতি আরোপ করে থাকে । যেমন : বৃষ্টিবর্ষণ, বৃক্ষের উদগমন ও ফলদান ইত্যাদি খোদায়ী কীর্তি বলে আখ্যায়িত হয়। এ জন্যে সুপারিশ করা হয় যে, মানুষ যেন এ খোদায়ী কীর্তিকে খোদার উলমে^ নিকটবর্তী যে নির্বাহকসমূহ বিদ্যমান সেগুলোতে উপলব্ধি ও স্বীকার করে এবং সর্বদা এ সম্পর্কে চিন্তা করে।

অনুধাবনের জন্যে দনন্দিন জীবন থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ করব : যদি কোন কার্যালয়ের প্রধান কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন কর্ম সম্পাদনের জন্যে আদেশ প্রদান করে, তবে কর্মটি আদিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত হলেও উচ্চ পর্যায়ে এর দায়- দায়িত্ব ঐ কার্যালয়ের প্রধানের উপরই বর্তায়। এমনকি জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

সুনির্ধারিত কর্তৃত্বের (فاعليت التكوينى) ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রম বিদ্যমান। 'সকল নির্বাহকের অস্তিত্বই মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল', এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা মস্তিষ্কগত কল্পিত বিষয়ের মতই, যা কল্পনাকারীর উপর নির্ভরশীল।

و لله المثل الاعلی

ফলে যে কোন কর্ম, যে কোন কর্তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হোক না কেন, উচ্চতর পর্যায়ে তা মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে, তাঁরই সুনির্ধারিত ইচ্ছায় (الارادة التکوينية) সম্পাদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم

'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত :

ক্রিয়াগত একত্ববাদের মোদ্দাকথা হল, 'মানুষ মহান আল্লাহ ব্যতীত কাউকে এবং কোন কিছুকেই উপাসনার জন্যে যোগ্য বলে মনে করবে না'। কারণ ইতিপূর্বে যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছিলাম যে, বান্দার নিকট তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা ব্যতীত কেউই উপাসনার যোগ্য হতে পারেনা। অন্যকথায় : প্রভুত্ব হল সৃজন ও পালন কতৃত্বের অবিয়োজ্য ভাষ্য ।

অপরদিকে তাওহীদের শেষোক্ত অর্থটি (স্বাধীন প্রভাব) থেকে প্রাপ্ত উপসংহারটি হল : মহান আল্লাহর উপর মানুষের পূর্ণ আস্থা থাকা, সকল কর্মের জন্যেই তাঁর উপর নির্ভর করা ও একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, একমাত্র তাঁরই নিকট আশা করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় না করা; এমন কি প্রত্যাশা ও চাহিদাসমূহ পূরণের স্বাভাবিক ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত না থাকলেও নিরাশ না হওয়া। কারণ মহান আল্লাহ স্বাভাবিক পথ ভিন্ন অন্য কোন পথেও তাঁর বান্দার চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

আর (উপরোক্ত অর্থদ্বয়ের অনুসারী) এমন কোন মানুষই প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এবং অভূতপূর্ব মানসিক ও আত্মিক তুষ্টিতে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়ে থাকেন।

(أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)

জেনে রাখ ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা ইউনুস - ৬২)

উপরোক্ত সিদ্ধান্তদ্বয় নিম্নলিখিত আয়াতশরীফে সন্নিহিত রয়েছে - যে আয়াতটি প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যহ কমপক্ষে দশবার আবৃতি করে থাকে।

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

(প্রভু হে!) আমরা আপনারই উপাসনা করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।(সূরা ফাতিহা- ৫)

একটি ভুল ধারণার অপনোদন :

এখানে সম্ভবতঃ একটি ভুল ধারণার অবকাশ থাকতে পারে। যথা : যদি পরিপূর্ণ তাওহীদের দাবি এটা হয়ে থাকে যে, মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে না। তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও ওলীগণের توسل করা বা শরণাপন্ন হওয়াও সঠিক হতে পারে না।

প্রতিউত্তরে বলতে হয় : আল্লাহর ওলীগণের শরণাপন্ন হওয়া যদি এ অর্থে হয় যে, তারা স্বাধীনভাবে ও আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীতই শরণার্থীর কোন কর্ম সম্পাদন করবেন, তবে এ ধরনের তাওয়াসসুল তাওহীদের সাযুজ্য হতে পারে না। কিন্তু যদি এ অর্থে হয় যে, মহান আল্লাহ ওলীগণকে স্বীয় অনুগহের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং মানুষকেও তাদের শরণাপন্ন হওয়ার জন্যে আদেশ দিয়েছেন, তবে এ ধরনের তাওয়াসসুল একত্ববাদের সাথে কোন বিরোধ তো সৃষ্টি করেই না, বরং উপাসনা ও আজ্ঞাবহতার ক্ষেত্রে একত্ববাদের মর্যাদায় পরিগণিত হবে। কারণ তাঁরই (আল্লাহর) আদেশে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কিন্তু কেন মহান আল্লাহ এ ধরনের মাধ্যমসমূহকে স্থান দিয়েছেন এবং কেনই বা মানব সম্প্রদায়কে তাঁদের শরণাপন্ন হতে বলেছেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এ ঐশ্বরিক বিষয়টির পশ্চাতে একাধিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : আল্লাহর উপযুক্ত বান্দাগণের উচ্চ মর্যাদার পরিচয় প্রদান, উপাসনা ও আনুগত্যের পথে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান - যা তাঁদের এ সম্মানিত স্থানে পৌঁছার কারণ মানুষকে তাদের ইবাদত ও আনুগত্যের জন্যে অহংকার করা থেকে বিরত রাখা এবং যারা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ

আসনের অধিকারী ও পূর্ণতম মানব হিসেবে মনে করেন তাদেরকে সে ভ্রান্তি থেকে মুক্তি প্রদান। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সর্বশেষে বর্ণিত ব্যাপারটি যারা আহলে বাইতগণের (আঃ) বিলায়াতকে অস্বীকার করে এবং যারা তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ।

১৮তম পাঠ

জাবর ও এখতিয়ার

ভূমিকা :

যেমনটি পূর্ববর্তী পাঠসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'স্বাধীন কীর্তিতে তাওহীদ' হল একটি অমূল্য শিক্ষা, যা মানুষের আত্মপরিশুদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এ জন্যেই পবিত্র কোরানে এ বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে তার সঠিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন : সকল বিষয়কে প্রভুর অনুমোদন, ইচ্ছা, ক্বাজা ও ক্বাদারের সাথে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করা।

তবে এ বিষয়টির সঠিক অনুধাবনের জন্যে একদিকে যেমন : বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত বিকাশের প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষার প্রয়োজন। যারা যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ঘাটতিতে আছেন অথবা কোরানের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী ও পবিত্র পথপ্রদর্শকগণের শিক্ষা- দীক্ষা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, তারা নিজেদেরকে বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছেন। তারা এ বিষয়টিকে, যে কোন প্রকারের প্রভাব ও কারণত্ব একান্তই মহান আল্লাহ থেকে - এ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং কোরানের সুস্পষ্ট আয়াতের ব্যতিক্রমে যে কোন প্রকার প্রভাব ও কারণত্বকে মাধ্যম ও(উলম্বিক) কারণসমূহ থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে আল্লাহর প্রকৃতি এরূপ যে, তিনি আগুনের উপস্থিতিতে তাপ সৃষ্টি করেন অথবা আহার গ্রহণ ও পানি পানের সময় ক্ষুধা নিবারণ ও তৃপ্তিকে অস্তিত্বে আনেন, নতুবা তাপ, ক্ষুধা নিবারণ ও তৃপ্তির জন্যে আগুন, আহার ও পানির কোন ভূমিকা নেই।

এ চিন্তাগত বিচ্যুতির কুফলগুলোকে আমরা মানুষের স্বাধীন কর্মকাণ্ড ও তার দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় স্থান দিব। অর্থাৎ এ ধরনের চিন্তার ফল হল : মানুষের কর্মকাণ্ডের দায়-

দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহর উপর বর্তায় এবং ঐ সকল কর্মকান্ডের ব্যাপারে মানুষের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয়। ফলে কেউই তার কর্মের জন্যে দায়ী হবে না।

অন্যকথায়: এ ধরনের বক্রচিন্তার একটি ধ্বংসাত্বক প্রভাব হল, জাবরিয়াত ও মানুষের কর্তব্যপরায়ণতার অস্বীকৃতি তথা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের অস্বীকৃতি, নিস্ফলতা এবং মানসিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যা তথা ইসলামী বিধি- ব্যবস্থার অন্ত:সারশূন্যতা। কারণ যেখানে মানুষ তার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার রাখে না, সেখানে দায়িত্ব, কর্তব্য, আদেশ- নিষেধ এবং পুরস্কার- তিরস্কারের কোন প্রশ্নই আসে না। বরং সুনির্ধারিত বিন্যাস ব্যবস্থার নিরর্থকতা ও অসারতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ পবিত্র আয়াত, [১৮] রেওয়ায়াত ও বৃদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে যাপাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বলা যায়, এ বিশ্বপ্রকৃতিকে সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মানব সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাতে মনুষ্য সম্প্রদায় স্বীয় নির্বাচন ক্ষমতার মাধ্যমে সুকর্ম সম্পাদন, উপাসনা ও আনুগত্যের মাধ্যমে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করতঃ মহান আল্লাহর নকট্য লাভে সক্ষম হয় এবং মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভের জন্যে উপযুক্ত হয়। যদি মানুষের স্বীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নির্বাচনাধিকার না থাকে এবং কোন দায়িত্বও না থাকে তবে পুরস্কার, অনন্ত অনুগহ ও প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে তার কোন উপযুক্ততাও থাকবে না। ফলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ব্যাহত হবে। এবং সৃষ্টি জগৎ নিশীথের নাট্যশালায় পর্যবশিত হবে, যেন মানুষ আপন হাতে মূর্তি গড়ল ও অন্যের ইচ্ছাধীন তাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হল, অতঃপর কেউ কেউ পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হল, কেউবা আবার তিরস্কৃত ও শাস্তি প্রাপ্ত হল !

এ ভয়ংকর অপচিন্তার প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অভিলাষ। কারণ এর মাধ্যমে তারা তাদের আপন কুকর্মের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে এবং নিরীহ ও অসচেতন জনগোষ্ঠীকে নিজেদের দুঃশাসন ও নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করতে পেরেছে; একইসাথে সক্ষম হয়েছে যে কোন প্রকার

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন থেকে জনগণকে দূরে রাখতে। সত্যিকার অর্থে জাতিসমূহের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার জন্যে জাবরিয়াতকেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে গণনা করা উচিৎ।

অপরদিকে যারা কিছুটা হলেও এ বক্রচিন্তার দুর্বলতাগুলোকে অনুধাবন করতে পেরেছেন, কিন্ত না তারা পরিপূর্ণ তাওহীদ ও জাবরের অস্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছেন, না তারা পবিত্রও নিস্পাপ আহলে বাইতগণের (আঃ) জ্ঞানভাণ্ডার থেকে লাভবান হতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তারা সমর্পণবাদে (تفويض) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং মানুষের নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডকে মহান আল্লাহর প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত বলে মনে করেছেন । প্রকৃতপক্ষে তারাও অন্য এক প্রকার বিচ্যুতি ও বক্রচিন্তার জালে আটকা পড়েছেন এবং ইসলামের মহামহিম শিক্ষা- দীক্ষা ও তার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

কিন্তু যারা এর স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন এবং একই সাথে কোরানের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী ও শিক্ষকগণকে শনাক্ত করতে পেরেছেন, তারা এ বক্রচিন্তা থেকে পবিত্র থেকেছেন। তারা একদিকে যেমন স্বীয় নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডকে প্রভু প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে সম্পন্ন হয় বলে মনে করেছেন ও এতদসংশ্লিষ্ট সকল দায়- দায়িত্বকে গ্রহণ করেছেন, অপরদিকে তেমনি প্রভুর মহিমান্বিত স্বাধীন কীর্তিসমূহকে উচ্চ পর্যায়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ অমূল্য পরিচিতির স্বরূপকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

মহানবী হযরত মুহম্মাদ (সঃ) এর পবিত্র আহলে বাইতগণের (আঃ) নিকট থেকে যে রেওয়ায়েত আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনার সন্ধান মিলে, যেগুলো ক্ষমতা (استطاعت), জাবরের অস্বীকৃতি (نفی الجبر), সমর্পণবাদ (تفويض) ইত্যাদি শিরোনামে এবং অনুমতি (اذن), ইচ্ছা (مشيت و اراده), আল্লাহর ক্বাজা ও ক্বাদর ইত্যাদির অন্তর্ভূক্ত হয়ে হাদীস শরীফে সংরক্ষিত আছে। অনুরূপ এমনও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তিরা যেন এ সূক্ষ্ম বিষয়টি নিয়ে মাথা না ঘামায়। কারণ এতে তারা বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যাহোক জাবর ও এখিতয়ারের আলোচনার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যার সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে সেগুলির কোন কোন দিকের উপর সরল ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করব। অনুরূপ যারা এ বিষয়ের উপর অধিকতর গবেষণায় আগ্রহী, তাদেরকে পরামর্শ দিব যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর জ্ঞানার্জনের জন্যে যথেষ্ট ধর্য ও স্থর্য অর্জন করেন।

এখতিয়ারের ব্যাখ্যা :

সিদ্ধান্ত নেয়ার ও নির্বাচনের ক্ষমতা মানুষের পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বলে পরিগণিত। কারণ প্রত্যেকেই নির্ভুল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে স্বীয় অভ্যন্তরে একে খুজে পায়; যেমনিকরে অন্যান্য মানসিক অবস্থা সম্পর্কে এ জ্ঞানের মাধ্যমে অবগত হয়। এমনকি যখন কোন ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করে তখন ঐ সন্দেহের উপস্থিতিকেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা- দ্বন্দ্বকে নিজের মধ্যে স্থান দিতে পারে না ।

অনুরূপ যে কেউ স্বীয় অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিলেই অনুধাবন করতে পারে যে, কোন কথা বলবে ? না, বলবে না ? হাত নাড়বে ? না, নাড়বে না? আহার গ্রহণ করবে? না, করবে না? ইত্যাদি।

কোন কাজের সিদ্ধান্ত কখনো কখনো প্রবৃত্তিগত পাশবিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়। যেমন : ক্ষুধার্থ আহার গ্রহণের ইচ্ছা করে, তৃষ্ণার্ত পানি পানের ইচ্ছা করে ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদাকে তুষ্ট করার জন্যে এবং সুউচ্চ মানবিক মূল্যবোধকে বাস্তবায়নের জন্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেমন : কোন অসুস্থ স্বীয় রোগ নিরাময়ের জন্যে তিক্ত ঔষধ সেবন করে এবং লোভনীয় খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে অথবা কোন বিদ্যা অর্জনকারী জ্ঞানার্জন ও সত্য উদঘাটনের পথে স্বীয় বস্তুগত কামনা থেকে নিজেকে দূরে

রাখে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝে নিজেকে মুহ্যমান রাখে অথবা আত্মোৎসর্গকারী সনিক মর্যাদাপূর্ণ মূল্যবোধে পৌঁছার জন্যে এমনকি আপন প্রিয় জীবনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

প্রকৃতপক্ষে মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ তখনই ঘটে যখন বিভিন্ন প্রকারের চাওয়া- পাওয়ার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি চারিত্রিক প্রকৃষ্টতা, আত্মিক উৎকর্ষ, আল্লাহর নকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও পাশবিক কামনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যতোধিক কোন মানুষ স্বাধীনভাবে ও সচেতনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে কোন কর্ম সম্পাদন করবে, আত্মিক ও মানবিক উৎকর্ষ বা পশ্চাৎপদতার ক্ষেত্রে ততোধিক প্রভাব থাকবে এবং পরকালীন পুরস্কার বা শাস্তির জন্যে উপযুক্ততর হবে।

তবে পাশবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যে সব বিষয়ে এক রকম নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই কম- বেশী এ আল্লাহ প্রদত্ত ববভব (স্বাধীন নির্বাচনাধিকার) থেকে লাভবান হতে পারে এবং (প্রতিরোধের জন্যে) যতবেশী অনুশীলন করবে প্রতিরোধ ক্ষমতা ততবেশী দৃঢ়তর হবে ।

অতএব স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধা- দ্বন্দ্বের কোন সুযোগ নেই এবং এ বিবেকপ্রসূত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ, দ্বিধার মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সন্ধিগ্ধ করে ফেলা অনুচিৎ। যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছিলাম যে, স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হিসেবে সকল চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন ধর্মে এবং ঐশী বিধানে গৃহীত হয়েছে। এ মূলনীতি ব্যতিরেকে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য, প্রশংসা বা ভর্ৎসনা, শাস্তি বা পুরস্কারের কোনস্থান নেই ।

তবে যা এ স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকে বিচ্যুতির ও জাবরিয়াতের কারণ হয়েছে, তা কতগুলো ভ্রান্তধারণা ব কিছুই নয়। ফলে এ গুলোর জবাব দিতে হবে, যাতে কোন প্রকার কুমন্ত্রণা ও দ্বিধা- দ্বন্দ্বের সুযোগ না থাকে । আর তাই এখানে আমরা অতিশয় ভ্রান্ত ধারণাগুলোর অপনোদনে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

জাবরবাদীদের ান্ত ধারণার জবাব

জাবরবাদীদের গুরুতর ভুলধারণাগুলো ও ঐগুলোর জাবাব নিম্নে বর্ণনা করা হল :

১। মানুষের ইচ্ছা, অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি বা কামনা জাগরণের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ ধরনের কামনা, একদিকে যেমন মানুষের নির্বাচনের ক্ষমতাধীন নয়, অপরদিকে তেমনি কোন বাহ্যিক কারণের প্রভাবেও আন্দোলিত হয় না। অতএব স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার কোন স্থান থাকতে পারে না।

জবাব : আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির জাগরণ, স্বাধীন নির্বাচন ও সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে কোন কাজের সিদ্ধান্ত দেয় না, যার ফলে আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির জাগরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে বাধ্যতামূলক কোন ফলে উপনীত হবে। এর প্রমাণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে দ্বিধা- দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় এবং ঐ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে চিন্তা- ভাবনা ও ঐ কর্মের লাভ- লোকসানকে বিবেচনা করতে হয় এবং কখনো কখনো তা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২। জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, উত্তরাধিকার, গ্রন্থির ক্ষরণ, তদোনুরূপ পারিপার্শিক ও সামাজিক অবস্থাও মানুষের কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এবং তাদের পারস্পরিক আচার- ব্যবহারের বসাদৃশ্যও এ কারণগুলোর বসাদৃশ্যের ফলে রূপপরিগ্রহ করে। যেমনটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও মোটামুটি অনুমোদন পেয়েছে। অতএব মানুষের কীর্তি- কর্ম তার স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা থেকে পরিগৃহীত - এ কথা বলা যায় না।

জবাব : এখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করার অর্থ এ নয় যে, উল্লেখিত কারণগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা। বরং এর অর্থ এই যে, এ কারণগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও মানুষ এগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং যখন একাধিক প্রবৃত্তি বা কামনার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন সে তাদের একটিকে নির্বাচন করতে সক্ষম।

তবে এ কারণগুলোর কোন কোনটির তীব্রতা, কখনো কখনো ঐগুলোর ব্যতিক্রমী কোন কর্মের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ধরনের প্রতিরোধ ও নির্বাচন, বিনিময়ে উৎকর্ষ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব ফেলে এবং পুরস্কারের জন্যে তার উপযুক্ততাকে অধিকতর করে থাকে, যেমন : নিদারুন উৎকন্ঠা ও অন্যান্য কঠিন অবস্থা, অপরাধ ও শাস্তি লাঘবের কারণ হয়ে থাকে।

৩। জাবরবাদীদের অপর একটি ভুল ধারণা হল : মহান আল্লাহ বিশ্বের সকল ঘটনা- দুঘটনা সম্পর্কে উদাহরণতঃ মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, তা ঘটার পূর্বেই অবগত আছেন এবং প্রভুর জ্ঞান হল ভুল- ভ্রান্তি বিবর্জিত। সুতরাং সংগত কারণেই সকল ঘটনা মহান আল্লাহর অনাদি জ্ঞানানুসারেই ঘটে থাকবে যার ব্যতিক্রম করা অসম্ভব। অতএব স্বাধীন নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই।

জবাব : সকল ঘটনা যেরূপেই ঘটুক না কেন, প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং মানুষ কর্তৃক স্বাধীনভাবে নির্বাচিত কর্মকাণ্ডগুলোও স্বাধীনত্বের বশিষ্ট্যসহ মহান আল্লাহর অবগতির আওতায় অবস্থান করে। অতএব যদি জাবরিয়াতের বশিষ্ট্য সহকারে কোন ঘটনা ঘটে, তবে তা খোদার জ্ঞান বহির্ভূত ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হবে। যেমন : মহান আল্লাহ অবগত আছেন যে, কোন বিশেষ শর্তাধীন, কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিবে এবং তা সম্পন্ন করবে। এরূপ নয় যে, আল্লাহর জ্ঞান, স্বাধীন নির্বাচন ও ইচ্ছার সাথে উক্ত কর্মের সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ঘটনাটি ঘটা সম্পর্কেই অবগত। অতএব আল্লাহর অনাদি জ্ঞান, ইচ্ছা ও স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

জাবরবাদীদের অপর একটি ভ্রান্ত ধারণা, ক্বাজা ও ক্বাদার সংশ্লিষ্ট যা তাদের মতে মানুষের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার সাথে সাম স্যপূর্ণ নয়। আমরা পরবর্তী পাঠে এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

১৯তম পাঠ

ক্বাযা ও ক্বাদার

ক্বাযা ও ক্বাদরের তাৎপর্য :

ক্বাদার (قدر) শব্দটির অর্থ হল ‘পরিমাপ ’ এবং তাক্বদির (تقدير) শব্দটির অর্থ হল ‘পরিমাপন বা কোন কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে তরী করা ’ আর ক্বাযা (قضاء) শব্দটি ‘চূড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণ বা কর্ম সম্পাদন ’ (বুদ্ধিমত্তাগত প্রকারান্তরে) বা ‘মীমাংসা ’ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো এদুটি শব্দ সমার্থবোধক শব্দরূপে ‘ভাগ্যলিপি ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রভু কর্তৃক পরিমাপন অর্থ হল; মহান আল্লাহ সকল কিছুর জন্যেই সংখ্যাগত ও গুণগত স্থান, কাল ও পাত্রগত পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, যা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কারণ ও নির্বাহকের প্রভাবে বাস্তবরূপ লাভ করে থাকে। আর প্রভু কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণ বা মীমাংসার অর্থ হল এই যে, কোন ঘটনার ক্ষেত্র ও কারণ, ভূমিকাসমূহের উপযুক্ত যোগানের পর, মহান আল্লাহ ঐ ঘটনাকে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যানুসারে, তাক্বদিরের স্তর হল ক্বাযার পূর্বে, যার কয়েকটি পর্যায় বিদ্যমান। এ ‘ তাক্বদির ’ দূরবর্তী প্রারম্ভিকা (مقدمة البعيد) মধ্যবর্তী প্রারম্ভিকা (مقدمة المتوسط) ও নিকটবর্তী প্রারম্ভিকার (مقدمة القريب) সমন্বয়ে রূপ পরিগ্রহ করে এবং কোন কোন শর্ত বা কারণের পরিবর্তনে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। যেমন : ভ্রূণের দশাগুলো হল, যথাক্রমে শুক্রাণু (نطفه) জমাট রক্ত(علقه) মাংসপিণ্ড (مضغه) থেকে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে রূপান্তর। এ দশাগুলোই হল ভ্রূণের তাক্বদির, যা নির্দিষ্ট স্থান ও কালকেও সমন্বিত করে এবং এ পর্যায়গুলোর কোন একটির অনুপস্থিতি তার

তাক্বদিরের পরিবর্তন বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ক্বাযা হল একদশা বিশিষ্ট (دفعی) এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার শর্তও কারণের উপস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত - যা সুনিশ্চিত ও অলংঘনীয়।

(إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন শুধু বলেন ‘হও ’ এবং তা হয়ে যায় (সূরা আলে ইমরান-৪৭)। এ সম্পর্কিত আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেমন:সূরা বাক্বারা- ১৭, সূরা মারিয়াম-৩৫, সূরা গাফির- ৬৮।

কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কখনো কখনো ক্বাযা ও ক্বাদার সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা ‘সুনিশ্চিত ও অনিশ্চিত ’ এ দু‘ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয় বলেই কোন কোন রেওয়ায়েত ও দোয়ায় ‘ক্বাযাকে ’ পরিবর্তনশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : সাদকাহ্, পিতা- মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং দোয়া করা ইত্যাদি ক্বাযার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে বলে বর্ণিত হয়েছে।

তাত্ত্বিক এবং প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদার :

কখনো কখনো ঐশী ‘তাক্বদির ও ক্বাজা ’ কথাটি, ঘটনা সংঘটনের প্রারম্ভিকা, কারণ ও শর্তের যোগান সম্পর্কে, তদনুরূপ তার সুনিশ্চিত সংঘটন সম্পর্কে ‘মহান আল্লাহর জ্ঞান’, অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তখন একে ‘তাত্ত্বিক ক্বাযা ও ক্বাদার' (القضا و القدر العلمی) বলা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো কোন ঘটনার সাথে তার পর্যায়ক্রমিক দশাগুলোর সম্পর্ক এবং অনুরূপ তাদের প্রত্যক্ষ সংঘটনে মহান আল্লাহর সম্পর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তখন একে প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদার। (القضا و القدر الغینی) বলা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন আয়াত ও রেওয়ায়েত থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, সকল ঘটনা ঠিক যেরূপ বাস্তব জগতে সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে প্রভুর জ্ঞান, 'লৌহে মাহফুজ ' নামক পবিত্র ও সমুন্নত সৃষ্ট বিষয়ে সংরক্ষিত আছে। যিনি মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে এর সান্নিধ্যে পৌঁছবেন, তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনা সম্পর্কে অবগত হবেন। অনুরূপ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ফলকসমূহও (الواح) বিদ্যমান, যেখানে ঘটনাসমূহ অসমাপ্ত ও শর্তযুক্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) এর নকট্যে সক্ষম হন তবে তিনি সীমাবদ্ধ সংবাদ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন, যা শর্তাধীন ও পরিবর্তনযোগ্য। সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত আয়াতটি এ দু'ধরনের ভাগ্যলিপি সম্পর্কেই সাক্ষী প্রদান করে :

(يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)

আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তাই প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল। (সুরা রা'দ- ৩৯)

উল্লেখ্য অনিশ্চিত ও শর্তাধীন 'তাক্বদীরসমূহকে ' রেওয়ায়েতের ভাষায় 'বাদা (بداء) নামকরণ করা হয়েছে।

যা হোক 'তাত্ত্বিক ক্বাযা ও ক্বাদারের ' প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর অনাদি জ্ঞান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অপেক্ষা সমস্যাসংকুল নয়। পূর্ববর্তী পাঠে খোদার জ্ঞান সম্পর্কে, জাবরবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার উপর আলোচনা করা হয়েছিল এবং সেখানে তাদের ধারণার অন্তঃসার শুন্যতা প্রতিপন্ন হয়েছিল।

কিন্তু 'প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদারের ' প্রতি বিশ্বাস বিশেষ করে 'সুনিশ্চিত ভাগ্যলিপির ' প্রতি বিশ্বাস কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুতরাং ঐ সমস্যাগুলোর সমাধানে সচেষ্ট হব - যদিও এর সংক্ষিপ্ত উত্তর ' স্বাধীন প্রভাব ' শিরোনামে একত্ববাদের আলোচনায় দেয়া হয়েছে।\

মানুষের এখতিয়ারের সাথে ক্বাযা ও ক্বাদারের সম্পর্ক

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাসের দাবি হল এই যে, সৃষ্টবিষয়ের অস্তিত্বকে, সৃষ্টির শুরু থেকে বিকাশকাল পর্যন্ত ও তৎপর অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত, এমনকি দূরবর্তী প্রারম্ভিকার যোগান কালকেও প্রজ্ঞাবান প্রভুর জ্ঞানাধীন বলে বিশ্বাস করা। তেমনি সৃষ্টির শর্তসমূহের যোগান ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাকে প্রভুর ইচ্ছা বা ইরাদা সংশ্লিষ্ট বলে গণনা করা।[১৯]

অন্যকথায় : সব কিছুরই অস্তিত্ব খোদার অনুমতি ও সুনির্ধারিত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন কিছুই অস্তিত্বের ময়দানে পা ফেলতে পারেনা। তেমনি সব কিছুই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদির ও ক্বাযার উপর নির্ভরশীল, যা ব্যতীত কোন অস্তিত্বশীলই স্বীয় আয়াতন, আকৃতি ও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় না ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে না। এ সম্পর্কের বর্ণনা ও এর স্বপক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান হল প্রকৃতপক্ষে 'স্বাধীন প্রভাব ' অর্থে তাওহীদেরই শিক্ষা, যা হল একত্ববাদের সর্বোচ্চস্তর এবং যা মানব সম্প্রদায়ের আত্মোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে - যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি।

বিষয়বস্তুর সংঘটন প্রভুর অনুমতি এবং তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এর প্রমাণ অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও সহজবোধ্য। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায় এবং প্রভুর ক্বাযায় এর নিশ্চিত নির্ধারণের সাক্ষ্য, দুস্প্রাপ্যতার কারণে অধিকতর আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ এ ধরনের বিশ্বাসের সাথে, 'আপন ভাগ্যলিপির পরিবর্তনে মানুষের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ' বা 'এখতিয়ারের ' স্বীকৃতির সমন্বয় খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর ফলেই এক শ্রেণীর মোতাকাল্লেমিন (আশায়েরী) যারা মানুষের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রভুর ক্বাযাকে স্বীকার করেছিলেন, তারা জাবরবাদের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন। আবার অপর এক শ্রেণীর মোতাকাল্লেমিন (মো ' তাযেলী) যারা জাবর ও এর শোচনীয় পরিণতিকে গ্রহণ করতে পারেননি, তারা মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডকে প্রভুর ক্বাযার অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেননি। উভয়দলই নিজেদের মতের বিরোধী আয়াত ও রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে

চেয়েছেন যেগুলো জাবর ও তাফবিজ সম্পর্কে আলোচনায় কালমশাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তকে ও বিশেষ গবেষণাপত্রসমূহে সন্নিবেশিত আছে।

মূল সমস্যাটি হল : যদি মানুষের কর্মকাণ্ড প্রকৃতই তার স্বাধীন নির্বাচনাধীন ও তার ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে কিরূপে একে প্রভুর ইচ্ছা ও ক্বাযার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা সম্ভব? আবার যদি প্রভুর ক্বাযার সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে, তবে কিরূপে তাকে মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীনও ইচ্ছাধীন বলে গণনা করা সম্ভব ?

অতএব এ সমস্যার সমাধানের জন্যে এবং মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন ও ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে দলিলের সাথে, প্রভুর ক্বাযা ও ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে দলিলের সমন্বয়ের জন্যে 'একই কার্যের একাধিক কারণ' শিরোনামে একটি আলোচনা ও পর্যালোচনায় প্রয়াসী হব, যাতে মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ড ও মহান প্রভুর ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে দলিল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়।

একাধিক কারণের প্রভাব :

কোন একটি বিষয়ের অস্তিত্বের জন্যে একাধিক কারণের প্রভাব বিভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয় :

১। একাধিক কারণ যুগপৎ ও পাশাপাশি ক্রিয়া করে থাকে। যেমন : বীজ, পানি ও তাপমাত্রা ইত্যাদির সমন্বয়ে বীজ বিদীর্ণ হয়ে অংকুরোদগম ঘটে।

২। কারণগুলো পালাক্রমে এরূপে ক্রিয়া করে যে, সৃষ্টের জীবদ্দশা একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক ভাগ পালাক্রমে তাদের কোন একটি কারণের কার্যে (معلول) পরিণত হয়ে থাকে। যেমন : বিমানের কয়েকটি মোটর পালাক্রমে পরিচালিত হয়ে একে গতি দান করে থাকে।

৩। তাদের প্রভাবগুলো হল পারস্পরিক। যেমন : কয়েকটি বল ঐগুলোর গতিগথে পরস্পরের সাথে যে সংঘর্ষ করে তাতে অথবা ধারাবাহিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও এরূপ পরিলক্ষিত হয়।এর অপর একটি উদাহরণ হল : হস্তের গতিতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব, কলমের গতিতে হস্তের প্রভাব, লিখনের অস্তিত্বে কলমের প্রভাব ।

৪। পরস্পরের উল্লাম্বে অবস্থানকারী কারণসমূহের পারস্পরিক প্রভাব এরূপ যে, এদের একটির অস্তিত্ব অপরটির উপর নির্ভরশীল (উচ্চক্রমানুসারে)। এটি পূর্ববর্তী (হস্ত, কলম ও ইচ্ছার) উদাহরণের ব্যতিক্রম, যেখানে কলমের অস্তিত্ব, হস্তের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল না; অনুরূপ হস্তের অস্তিত্ব, মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না।

যা হোক একক কার্যের উপর একাধিক কারণের প্রভাবের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত সবগুলো অবস্থাই সম্ভব। তবে স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মানুষের ইরাদা ও মহান আল্লাহর ইরাদার প্রভাব শেষোক্ত প্রকারের মত। কারণ মানুষ ও তার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আল্লাহর ইরাদার উপর নির্ভরশীল।

একক কারণের উপর দু'টি কারণের সামষ্টিক প্রভাব, কেবলমাত্র তখনই অসম্ভব, যখন উভয়ই অস্তিত্বদাতা কারণ হবে, অথবা তাদের সমষ্টি নিষিদ্ধ এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে। যেমন : দু'ইরাদাকারীর (অনুভূমিক) {মানুষের ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার উল্লাম্বে অবস্থান করে- আনুভূমিকা অবস্থানে বা খোদার সমন্তরালে নয়} একই ইরাদায় অনুপ্রবেশ অথবা একই সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে দু'চূড়ান্ত কারণের প্রভাব।

ান্ত ধারণার অপনোদন :

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানুষেরস্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের অস্তিত্বের সাথে মহান আল্লাহর ইরাদার কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না।কারণ এরা পরস্পর পরস্পরের উল্লাম্বে অবস্থান করে এবং পারস্পরিকভাবে কোন প্রকার বিরোধ বা সংঘর্ষ তাদের মধ্যে নেই।

অন্যকথায় : কোন কর্মের সাথে মানব কতৃত্বের সম্পর্ক এক স্তরে এবং ঐ কর্মের অস্তিত্বের সাথে খোদার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরে অবস্থান করে। আর এ স্তরে মানুষের অস্তিত্ব, যে বস্তুর উপর মানুষ ক্রিয়া করে তার অস্তিত্ব, কর্ম- সম্পাদনের উপকরণসমূহের অস্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুই খোদার উপর নির্ভরশীল।

অতএব শেষোক্ত শ্রেণীর চূড়ান্ত কারণরূপে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর তার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবের সাথে, খোদার উপর নির্ভরশীল চূড়ান্ত কারণের সকল সদস্যের অস্তিত্বের কোন বিরোধ নেই। এ বিশ্ব, মানুষ ও তার সকল মানবীয় মর্যাদার অস্তিত্ব মহান আল্লাহরই নিকট এবং তিনিই প্রতিনিয়ত ঐগুলোকে অস্তিত্ব প্রদান করে থাকেন; আর নতুন নতুন রূপে তাদেরকে সৃষ্টি করেন। কোন অস্তিত্বশীলই, কোন অবস্থায় ও কালেই তাঁর থেকে অনির্ভরশীল নয়। অতএব যে সকল কর্মকাণ্ড মানুষের নির্বাচনাধীন, সে সকল কর্মকাণ্ডও মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষী নয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদার সীমানাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। অনুরূপ সৃষ্টির সকল বশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, আয়তন, আকৃতিও মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদির ও ক্বাযার উপর নির্ভরশীল। এমন নয় যে, হয় মানুষের ইচ্ছার মুখাপেক্ষী, নতুবা মহান আল্লাহর ইরাদার মুখাপেক্ষী। কারণ এ ইরাদাদ্বয় পরস্পরের সমান্তরালে বা অনুভমে অবস্থান করে না বা নিষিদ্ধ সমন্বয় (مانع الجمع) নয় এবং কোন কর্ম সম্পাদনে এ ইরাদাদ্বয়ের প্রভাব পরস্পরের বিকল্প হিসাবে ক্রিয়া করে না। বরং মানুষের ইচ্ছাশক্তি তার মূল অস্তিত্বের মতই মহান আল্লাহর ইরাদার উপর নির্ভরশীল এবং মহান আল্লাহর এ ইরাদা তার অস্তিত্ব লাভের জন্যে অপরিহার্য।

(وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা তাকভির-২৯)

ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাসের ফল:

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাস, খোদা পরিচিতির সমুন্নত মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মানুষের উৎকর্ষের কারণ বলে পরিগণিত হওয়া ছাড়াও এর বহুবিধ কার্যকরী প্রভাব বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফলে এখানে আমরা অপর কিছুর বর্ণনা করব :

যদি কেউ ঘটনার সংঘটনকে মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও ক্বাযা- ক্বাদরের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন তবে তিনি যে কোন অপ্রীতিকর অবস্থায় ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন না এবং ঐ পরিস্থিতির কাছে পরাজয় বরণ করেন না ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন না। বরং মনে করেন যে এ ঘটনাও মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা বা হিকমাতপূর্ণ বিন্যাস- ব্যবস্থারই অংশ এবং কল্যাণ ও হিকমাতের ছায়াতলেই সংঘটিত হয়েছে বা হয়ে থাকবে। ফলে সানন্দে এ অবস্থাকে স্বাগতম জানায় এবং ধৈর্য, আস্থা, তুষ্টি ও মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মত কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে।

অনুরূপ ক্বাযা ও ক্বাদারে বিশ্বাসীগণ জীবনে আমোদ- প্রমোদে মুহ্যমান, বিমোহিত কিংবা প্রতারিত হন না অথবা এগুলোর জন্যে অহংকার ও প্রাণ- চাঞ্চল্যতা প্রদর্শন করেন না বা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহকে আভিজাত্য ও আত্মম্ভরিতার বিষয়রূপে গণনা করেন না।

ক্বাযা ও ক্বাদরের প্রতি বিশ্বাসের এ মূল্যবান প্রভাব হল তা- ই যা নিম্নলিখিত আয়াত শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের জীবনের উপর (অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে) কোন বিপর্যয় আসে না, কিন্তু এসবই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে; আর আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। এটা এই জন্যে যে, যা কিছু তোমরা হারিয়েছ তাতে যেন বিমর্ষ এবং যা কিছু তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তার প্রতি আসক্ত ও হর্ষোৎফুল্ল না হও, আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা হাদীদ- ২২, ২৩)

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ক্বাযা ও ক্বাদার, আর স্বাধীন প্রভাবে একত্ববাদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা যেন উদাসীনতা, অলসতা, হীনতা, অত্যাচারিত হওয়া এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার

কারণ না হয়। আর এটাই সর্বদা স্মরণ করব যে, মানুষের চিরন্তন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য স্বীয় নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতেই অর্জিত হয়ে থাকে।

(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)

সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। (সুরা বাকারা - ২৮৬)

তদনুরূপ,

(أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)

আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে। (সুরা নাজম- ৩৯)

২০তম পাঠ

আল্লাহর ায়পরায়ণতা

ভূমিকা :

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে কালামশাস্ত্রবিদগণের দু'সম্প্রদায়ের (আশায়েরী ও মো'তাজেলী) মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করেছি। এ বিষয়গুলোর মধ্যে কালাম, ইরাদা, গুণগত একত্ববাদ, জাবর ও এখিতয়ার এবং ক্বাযা ও ক্বাদারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দু'সম্প্রদায়ের মতামত ছিল চরম প্রান্তিক ও বাড়াবাড়ি ধরনের।

এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ অপর একটি বিষয় হল প্রভুর ন্যায় পরায়ণতা (عدل الهی)। উল্লেখ্য এ বিষয়টির ক্ষেত্রে শিয়া মাযহাবের মতামত মো'তাজেলীদের অনুরূপ। আশায়রীদের প্রতিকুলে এ দু'সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে আদলিয়াহ (عدلية) নামকরণ করা হয়ে থাকে। কালামশাস্ত্রে এ বিষয়টির উপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, মুখ্য বিষয়সমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। এমনকি একে আক্বায়েদের মূলনীতি এবং শিয়া ও মো'তাজেলী মাযহাবের কালামশাস্ত্রের বিশেষত্ব বলেও মনে করা হয়েছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আশায়েরীগণও আল্লাহর আদল বা ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করেন না অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহকে অত্যাচারী (আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন) মনে করেন – যেখানে কোরানের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রমাণ বহন করে এবং যে কোন প্রকারের জুলুমও অত্যাচারের অপবাদ থেকে প্রভু সত্তাকে পবিত্ররূপে প্রকাশ করে। বরং বিতর্কের বিষয় হল এটা যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কি শরীয়ত, কিতাব ও সুন্নতের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম, বিশেষ করে ঐশী কর্মকাণ্ডের মানদণ্ড নিরূপণে সক্ষম যার উপর ভিত্তি করে কোন কর্মের গ্রহণ বা বর্জনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে? যেমন : বলবে যে, মু' মেনগণকে বেহেস্তে, আর কাফেরদেরকে দোযখে প্রেরণ করা মহান আল্লাহর জন্যে অপরিহার্য।

না কি, এ ধরণের সিদ্ধান্ত দান কেবলমাত্র ওহীর ভিত্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে, যা ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ?

অতএব বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হল তাতেই, যাকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল- মন্দ ' الحسن و القبح العقلی বলা হয়ে থাকে। আশায়েরীরা একে অস্বীকার করে এবং সুনির্ধারিত বিষয়ে (امور تکوینی) বিশ্বাস স্থাপন করে, অর্থাৎ যা মহান আল্লাহ সম্পাদন করেন তা- ই সুকর্ম, আর (বিধিগত বিষয়ে) তিনি যা আদেশ করেন তা- ই ভাল এমন নয় যে, যেহেতু কর্মটি ভাল, তাই তিনি এটা সম্পাদন করেন বা সম্পাদন করার আদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু, আদলিয়াহগণ বিশ্বাস করেন যে, কর্মকাণ্ডসমূহ সুনির্ধারিত ও বিধিগত হিসেবে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিতকরণ ব্যতীতই, ভাল অথবা মন্দ নামে অভিষিক্ত হয়ে থাকে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভাল- মন্দকে অনুধাবন করতে ও প্রভু সত্তাকে সকল প্রকার মন্দকর্ম সম্পাদন করা থেকে পবিত্র ভাবতে সক্ষম। তবে তা মহান আল্লাহর প্রতি আদেশ- নিষেধ করা (মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) অর্থে নয়। বরং এ অর্থে যে, কোন কর্ম মহান আল্লাহর কামালিয়াতের সাথে সম্পর্কিত কি- না। আর এর উপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ কর্তৃক মন্দকর্ম সম্পাদনকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়।

এটা অনস্বীকার্য যে, এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা এবং আশায়েরীদের পক্ষ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল- মন্দের ধারণার অস্বীকৃতি ও অবশেষে যা তাদেরকে আদলিয়াহদের বিপরীত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, তার জবাব প্রদান, এ প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। অনুরূপ এ ব্যাপারে মো'তাযেলীদের বক্তব্যেরও অনেক দুর্বলতা থাকতে পারে, যে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা উচিৎ। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল- মন্দের মূলভাষ্য শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত, কিতাব ও সুন্নতের উৎস থেকে অনুমোদিত ও মাসুমগণ (আঃ) কর্তৃক গুরুত্বারোপকৃত হয়েছে ।

ফলে আমরা এখানে সর্বপথমে আদলের ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করব। অতঃপর মহান আল্লাহর এ ক্রিয়াগত গুণের স্বপক্ষে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের উল্লেখ করব। সর্বশেষে এ বিষয়টি সম্পর্কে বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণাসমূহের জবাব প্রদানে সচেষ্ট হব।

আদলের) ায়পরায়ণতার (তাৎপর্য:

আদলের (عدل) আভিধানিক অর্থ হল বরাবর বা সমমান সম্পন্ন করা এবং সাধারণের ভাষায় অত্যাচারের (অপরের অধিকার হরণ) বিরুদ্ধে অপরের অধিকার সংরক্ষণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আদলকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

اعطاء کل ذی حق حقه

যার যার অধিকার তাকে প্রদান করা।

অতএব সর্বাগ্রে এমন এক অস্তিত্বকে বিবেচনা করতে হবে যার অধিকার আছে; অতঃপর তার সংরক্ষণকে ন্যায়বিচার বা আদল (عدل), আর তার লংঘনকে অত্যাচার বা জুলুম (ظلم) নামকরণ করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো আদলের ধারণার সম্প্রসারণে বলা হয়ে থাকে :

وضع کل شئ فی موضعه

প্রত্যেক বস্তুকেই তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করা।

অর্থাৎ সকল কিছুকে যথাস্থানে সংস্থাপন অথবা সকল কর্মকে উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করণই হল ‘ আদল ’ । আর এ সংজ্ঞানুসারে আদল, প্রজ্ঞা (حکمت) ও ন্যায়ভিত্তিক কর্মের সমার্থবোধক অর্থ বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম অর্থে রূপ পরিগ্রহ করে। তবে কিরূপে ‘অধিকারীর অধিকার ’ এবং সকল কিছুর যথোপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয় - এ সম্পর্কে বক্তব্য অনেক - যা ‘আখলাক্বের দর্শন ’ ও ‘অধিকারের দর্শন ’ রূপে গুরুত্বপূর্ণ শাখা সৃষ্টি করেছে। স্বভাবতঃই এখানে আমরা এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারব না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল : সকল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই অনুধাবন করতে পারে যে, যদি কেউ কোন কারণ ছাড়াই কোন অনাথ শিশুর হাত থেকে এক টুকরা রুটিও ছিনিয়ে নেয় অথবা নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরায়, তবে সে জুলম করেছে এবং অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। আবার বিপরীতক্রমে, যদি কেউ ছিনতাইকারীর নিকট থেকে ছিনতাইকৃত রুটির লোকমা উদ্ধার করে, ঐ অনাথ শিশুকে ফিরিয়ে দেয় অথবা অপরাধী ঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে, তবে সে ন্যায়বিচার করেছে বা সঠিক কর্মসম্পাদন করেছে। এ সিদ্ধান্তগুলো প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিষেধের উপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি যদি কেউ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নাও হয়ে থাকে, তবে সেও এ ধরনের সিদ্ধান্তই নিবে।

কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্তের গুঢ় রহস্য কী বা কোন সে শক্তির মাধ্যমে মানুষ ভাল- মন্দকে অনুধাবন করে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে দর্শনের একাধিক শাখায় আলোচনা করতে হবে ।

সিদ্ধান্ত : আদলের জন্যে বিশেষ ও সাধারণ এ দু'ধরনের ভাবার্থকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এদের একটি হল 'অন্যের অধিকার সংরক্ষণ ' এবং অপরটি হল 'প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম সম্পাদন ' যেখানে ' অন্যের অধিকার সংরক্ষণ ' এর একটি দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হবে ।

অতএব আদলের অবিচ্ছেদ্য অর্থ, সকল মানুষকে বা সকল কিছুকে এক বরাবর বা এক রেখায় স্থাপন নয়। যেমন : ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক তিনিই নন যিনি পরিশ্রমী বা অলস নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই একরূপ প্রশংসা বা ভর্ৎসনা করবেন। অনুরূপ ন্যায়বিচারক তিনিই নন যিনি বিবাদপূর্ণ কোন সম্পদকে, কলহে লিপ্ত দু'পক্ষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করবেন। বরং ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক তিনিই যিনি সকল ছাত্রকে তাদের যোগ্যতানুসারে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করবেন। তদনুরূপ ন্যায়বিচারক তিনিই যিনি বিবাদপূর্ণ সম্পদকে এর প্রকৃত মালিকের নিকট অর্পণ করবেন।

একইভাবে প্রভুর প্রজ্ঞা ও আদলের দাবী এটা নয় যে, সৃষ্টির সবকিছুকেই সমানভাবে সৃষ্টি করবেন। যেমন : মানুষকেও শিং, কেশর বা পাখা ইত্যাদি দিবেন। বরং সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞার দাবী হল এই যে, বিশ্বকে তিনি এরূপে সৃষ্টি করবেন যাতে সর্বাধিক কল্যাণ ও উৎকর্ষ অর্পিত হয় এবং

বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয় যেগুলো এ জগতের সুসংহত অংশসমূহ রূপে পরিগণিত, সে গুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করবেন, যেন ঐ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের (উৎকর্ষ ও কল্যাণ) সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অনুরূপ প্রভুর আদল ও প্রজ্ঞার দাবী হল এই যে, সকল মানুষকেই তার যোগ্যতানুসারে দায়িত্ব প্রদান। অতঃপর তার স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও প্রচেষ্টার আলোকে তার বিচার করণ এবং পরিশেষে তার কর্মফলস্বরূপ তাকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা।

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। (সূরা বাকারা - ২৮৬)

(وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

তাদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সাথে করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলম করা হবে না। (সূরা ইউনুস - ৫৪)

(فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

আজ কারও প্রতি জুলম করা হবে না এবং তোমরা যা করেছ কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (সুরা ইয়সীন - ৫৪)

প্রভুর ায়পরায়ণতার প্রমাণ :

ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহান আল্লাহর হিকমাত বা প্রজ্ঞাধীন এবং অপর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজ্ঞারই অভিন্ন রূপ। স্বভাবতঃই এর প্রমাণও সে যুক্তির মাধ্যমেই করা হবে যা প্রভুর প্রজ্ঞাকে প্রতিপাদন করার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা হয়েছিল। একাদশ পাঠে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে এখানে আমরা এ সম্পর্কে আর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করব।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মহান আল্লাহ চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী। সম্ভাব্য অস্তিত্বের জন্যে কোন কর্ম সম্পাদন করার বা না করার ক্ষেত্রে তিনি কোন শক্তি কর্তৃক প্রভাবিত বা কোন শক্তির নিকটই পরাভূত নন। বরং তিনি ইচ্ছে করলে কোন কিছু নাও করতে পারেন এবং যা তিনি সম্পাদনের ইচ্ছে করবেন তাই করবেন।

অনুরূপ তিনি কোন অর্থহীন ও অহেতুক ইচ্ছা পোষণ করেন না। বরং যা কিছু তাঁর পূর্ণতমগুণের সাথে সাম স্যপূর্ণ তাই তিনি ইচ্ছা করেন। যদি তাঁর পূর্ণতম গুণ কোন কর্মকে দাবি না করে, তবে তিনি কখনোই তা সম্পাদন করেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ চূড়ান্ত পূর্ণতার অধিকারী, সেহেরতু তাঁর ইরাদাও মূলতঃ সৃষ্টির কল্যাণ ও পূর্ণতার দিকেই হয়ে থাকে এবং যদি কোন অস্তিত্বশীলের আস্তিত্ব বিশ্বে অনিবার্য অকল্যাণ ও অভিসম্পাতের কারণ হয়, তবে তা হয়ে থাকে প্রসঙ্গক্রমে। অর্থাৎ যেহেতু ঐ অকল্যাণ সর্বাধিক কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য বিষয়, সেহেতু প্রভুর ইরাদা বা ইচ্ছা উক্ত সর্বাধিক কল্যাণের অনুগামী হয়ে থাকে।

অতএব প্রভুর পূর্ণতম গুণের দাবি এই যে, বিশ্ব এমনভাবে সৃষ্টি হবে যাতে সম্মিলিতভাবে সম্ভাব্য সর্বাধিক পূর্ণতা ও কল্যাণ অর্জিত হয়। আর এখানেই মহান আল্লাহর জন্যে প্রজ্ঞা (حكمت) নামক গুণটি প্রতিপন্ন হয়।

এর ভিত্তিতে যেখানেই মানুষের অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান ও তার অস্তিত্ব সর্বাধিক কল্যাণের উৎস, সেখানেই মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভুর ইচ্ছার সমাপতন ঘটেছে। মানুষের একটি মৌলিক বিশেষত্ব হল এখিতয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা এবং নিঃসন্দেহে স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার অধিকার মানুষের একটি অস্তিত্বগত পূর্ণতা বলে পরিগণিত। আর যে অস্তিত্বশীল এ পূর্ণতার অধিকারী, সে অস্তিত্বশীল অপর কোন অস্তিত্বশীল, যা এর অধিকারী নয়, তা অপেক্ষা পূর্ণতর বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার জন্যে অপরিহার্য হল : মানুষ যেমনি সুকর্ম ও যথোপযুক্ত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অনন্ত ও চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে তেমনি কুকর্ম ও অপছন্দনীয় কর্মে লিপ্ত হয়ে অনন্ত দুর্দশা ও ক্ষতির পথে পতিত হতে পারবে। তবে প্রভুর ইরাদার বিষয় হল মূলতঃ মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তি। কিন্তু মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন

পূর্ণতার অবিয়োজন (لازمه) যেহেতু অধঃপতনের সম্ভাবনাযুক্ত, যা পাশবিক কামনা ও শয়তানী প্রবণতার অনুসরণে অর্জিত হয়, সেহেতু এ ধরনের স্বাধীন নির্বাচনাধীন অধঃপতনও সঙ্গত কারণেই প্রভুর ইরাদার বিষয়ে পরিণত হয়।

আবার যেহেতু সচেতনভাবে নির্বাচন করার জন্যে ভাল ও মন্দ পথগুলোর সঠিক পরিচিত প্রয়োজন সেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে যা কিছু তার কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ, তার প্রতি আহ্বান করেছেন এবং যা কিছু অধঃপতন ও অকল্যাণের কারণ, তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পূর্ণতার পথ সুগম হয়। অনুরূপ যেহেতু আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব মানুষকে তার কর্মফলে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে এবং তা মহান আল্লাহর জন্যে কোন কল্যাণ (বা অকল্যাণ) বয়ে আনে না, সেহেতু প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল বান্দার ক্ষমতানুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা। কারণ যে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব, সে দায়িত্ব অর্পণ করাটা হবে অনর্থক ও অহেতুক কর্ম।

অতএব আদলের প্রথম পর্যায় (বিশেষ অর্থে) অর্থাৎ দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, এ যুক্তিতে প্রতিপাদিত হয় যে, যদি মহান আল্লাহ বান্দাগণের ক্ষমতাতিরিক্ত দায়িত্ব তাদেরকে প্রদান করেন, তবে ঐ দায়িত্ব সম্পাদন অসম্ভব হবে এবং এটি একটি অনর্থক কর্ম বলে পরিগণিত হবে।(অথচ মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি হল তিনি অনর্থক কোন কর্ম সম্পাদন করেন না)।

আবার বান্দাগণের মধ্যে বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, এর উপর ভিত্তি করে প্রমাণিত হয় যে, এ বিচারকর্ম বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে বান্দাগণের অধিকার নির্ধারণের জন্যে সম্পাদিত হয়। যদি এ কর্ম ন্যায়নীতির পরিপন্থি হয় তবে উদ্দেশ্যহীন কর্ম বলে পরিগণিত হবে। (অথচ প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষে উদ্দেশ্যহীন কর্ম সম্পাদন অসম্ভব, কারণ সেটা তাঁর প্রজ্ঞার ব্যতিক্রম)।

অবশেষে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের আলোকে প্রমাণিত হয়। কারণ যিনি মানুষকে তার সুকর্ম ও কুকর্মের প্রতিফল প্রদানের জন্যে সৃষ্টি

করেছেন, যদি তিনি তাদেরকে তাদের লভ্য ও প্রাপ্তির ব্যতিক্রম কোন পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করেন তবে তা তাঁরই উদ্দেশ্যকে ব্যহত করবে।

অতএব প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার সর্বজনস্বীকৃত ও সঠিক দলিল হল এই যে, তাঁর সত্তাগত গুণই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মের কারণ এবং অত্যাচার, অবিচার অথবা অনর্থক ও অহেতুক কর্মের দাবিদার কোন গুণই তাঁর অস্তিত্বে বিরাজ করে না।

কয়েকটি ান্ত ধারণার জবাব :

১। সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে যে বসাদৃশ্য বিদ্যমান, কিরূপে তা আল্লাহর প্রজ্ঞাও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাম স্যপূর্ণ হতে পারে? কেন প্রজ্ঞাবান ও ন্যায়পরায়ণ প্রভু সকল সৃষ্টিকেই এক রকম করে সৃষ্টি করেন নি?

জবাব : অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে সৃষ্টির বসাদৃশ্য, সৃষ্টি ব্যবস্থার অপরিহার্যতা ও কার্যকারণত্বের অধীন হয়ে থাকে। সৃষ্টিকুলের সকলেই এক রকম হওয়ার ধারণা হল একটি স্থুল চিন্তা এবং যদি কিঞ্চিত পর্যবেক্ষণ করি দেখতে পাব যে, এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি ধারার বিরধী ব কিছু নয়। কারণ উদাহরণত : যদি সকল মানুষই হয় পুরুষ অথবা স্ত্রী হত, তবে সৃষ্টির ধারা ব্যহত হত এবং মানব সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যেত। আবার যদি সৃষ্টির সকলেই মানুষ হত তবে খাদ্যাহরণ ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ সম্ভব হত না। অনুরূপ যদি সকল পশু- পাখী ও বৃক্ষরাজি একই ধরণের এবং একই রং ও বশিষ্ট্যের অধিকারী হত, তবে এ অসণিত কল্যাণ, মনোমুগ্ধকর ও মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি হত না। সৃষ্টির এ বচিত্র ও বসাদৃশ্য, বস্তর পরিবর্তন ও বিবর্তন ধারায় একাধিক শর্ত ও কারণের অধীনে রূপপরিগ্রহ করে। সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কিছুকেই সৃষ্টির পূর্বে তার নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্রে স্থান দেন না, যাতে ন্যায়- অন্যায়ের কোন স্থান থাকবে।

২) এ মহাবিশ্বে মানবজীবনের অস্তিত্ব, যদি প্রভুর প্রজ্ঞার দাবী হয়ে থাকে তবে কেন মানুষকে মৃত্যদান করা হয় এবং তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয় ?

উত্তর:

প্রথমতঃ জীবন ও মৃত্য, এ বিশ্বে সুনির্ধারিত নিয়ম-নীতির অধীন ও কার্যকারণত্বের সাথে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টি ব্যবস্থার জন্যে অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন জীবন্ত অস্তিত্বশীল মৃত্যুবরণ না করত, তবে পরবর্তী অস্তিত্বশীলের জন্যে কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত হত না। ফলে পরবর্তীরা এ জীবন ' ও অস্তিত্বের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত। তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র মানুষের কথাই যদি ধরা হয় যে, সকল মানুষ অমর থাকুক, তবে অচিরেই তাদের জন্যে এ বিশ্বের আবাসস্থল সংকীর্ণ হয়ে পড়ত আর ব্যথা- বেদনা ও ক্ষুধার তীব্রতায় তখন সকলেই মৃত্যু কামনা করত। চতুর্থতঃ মানব সৃষ্টির পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, তাকে অনন্ত সুখ ও বভবে পৌঁছানো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানব সম্প্রদায় মৃত্যর মাধ্যমে এ বিশ্ব থেকে স্থানান্তরিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে না।

৩) এ সকল দুঃখ- কষ্ট, রোগ- ব্যাধি, প্রকৃতিক দুর্যোগসমূহ (যেমন : বন্যা ও ভূমিকম্প) ও সামাজিক সংকট (যেমন : যুদ্ধ ও অত্যাচার) ইত্যাদির অস্তিত্ব কিরূপে মহান আল্লাহর ন্যায়পরয়ণতার সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে ?

জবাব : প্রথমতঃ অনাকাংখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল বস্তুগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংঘর্ষের অবিযোজ্য ফল। যেহেতু এগুলোর কল্যাণ, অকল্যাণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, সেহেতু প্রজ্ঞা- বিরোধী নয়। অনুরূপ সামাজিক অনাচারের উদ্ভব হল মানুষের স্বাধীনতারই অবিযোজ্য ঘটনা যা, প্রভুর প্রজ্ঞারই দাবি। তদুপরি, সামাজিক জীবনের কল্যাণ, অকল্যাণের চেয়ে অধিক। আর যদি অকল্যাণ, কল্যাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করত, তবে পৃথিবীতে কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকত না। দ্বিতীয়তঃ এ দুঃখ- দুর্দশা ও সংকটের অস্তিত্ব, একদিকে যেমন প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে মানুষের প্রচেষ্টা এবং জ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের কারণ; অপরদিকে তেমনি, সংকটময় পরিস্থিতির সাথে সংগ্রাম করণের মাধ্যমে মানুষের বিকাশ, যোগ্যতার প্রস্ফুটন, অগ্রগতি ও পূর্ণতার জন্য এক বৃহত্তম নির্বাহক।

সর্বোপরি এ বিশ্বে দুঃখ- কষ্ট এবং যে কোন সংকটময় পরিস্থিতিতে যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই ধর্য ধারণ করেন, তবে পরকালীন অনন্ত জীবনে মহামূল্যবান পুরস্কার লাভ করবেন এবং সর্বোত্তম পন্থায় এর বিনিময় পাবেন।

৪) এ জগতে সীমাবদ্ধ পাপাচারের জন্যে অনন্ত শাস্তি প্রদান, কি করে প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাম স্যপূর্ণ হয়?

জবাব : সুকর্ম ও কুকর্ম এবং পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে এক প্রকার কারণগত সম্পর্ক বিদ্যমান, যা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে আবিস্কৃত ও মানুষের কর্ণগোচর করা হয়েছে। যেমন করে এ বিশ্বে কোন কোন ঘটনার সংঘটনে দীর্ঘকাল ধরে এর কুপ্রভাব বজায় থাকে। যেমন : নিজের চোখ বা অন্যের চোখ বিনষ্ট করতে এক মুহর্তের প্রয়োজন, কিন্তু আমৃত্য এর প্রতিফল বহন করে যেতে হয়। তেমনি ভয়ংকর পাপকর্মসমূহেরও পরকালীন চিরস্থায়ী কুফল বজায় থাকে এবং যদি কেউ এ বিশ্বে এর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা (যেমন : তওবাহ) না করে তবে এর কুফল তাকে অনন্তকাল পর্যন্ত বহন করতে হবে। যেমন করে এক মুহর্তের অপরাধের ফলে কোন মানুষের আমৃত্য অন্ধত্ব প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না, তেমনি ভয়ংকর পাপাচারের ফলে অনন্ত শাস্তিতে পতিত হওয়াও প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার ব্যতিক্রম নয়। কারণ এটি হল পাপীর সেই কর্মের ফল যাতে সে সচেতনভাবে লিপ্ত হয়েছে।

তথ্যসূ :

১. বিচ্যুতির উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, কোন কোন দ্বীনের অনুসারীরা অত্যাচারী ও প্রভাবশালীদের সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনকে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং দ্বীনের আহকামকে শুধুমাত্র ধর্মীয় কিছু আচার আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন।বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সমাজিক কার্যকলাপকে ধর্মবহির্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন।অথচ প্রতিটি ঐশী ধর্মই মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্যে সামাজিক ক্ষেত্রে ঐ সমাজের জনগণের দিকনির্দেশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।তবে মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে একে অনুধাবন করতে অপারগ। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।সর্বশেষ নবী, যিনি মহান প্রভু কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন, সঙ্গত কারণেই বিশ্বজগতের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ নিষেধ ও পরিচিতি, তার (সর্বশেষ নবী) নিকট প্রেরণ করেছেন। আর এ কারণেই ইসলামী শিক্ষার একটা বিশেষ অংশ জুড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার গুরুত্ব বিদ্যমান।

২. সূরা আল কিয়ামাহ- ৫ ।(بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ)

৩. (১০০০*৫)/১০০=৫০, (১০০*১০)/১০০=১০, . : ৫০/১০=৫

৪. তবে উল্লিখিত প্রমাণটির কৌশলগত প্রক্রিয়া: যদি লাভবান হওয়ার ও সমূহ ক্ষতি থেকে বেচে থাকার প্রবণতা মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা হয়ে থাকে, তবে যে দ্বীন অফুরন্ত লাভের এবং অসীম ক্ষতি থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়ার দাবিদার, সে দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করা অপরিহার্য (অনিবার্যতা হল কিয়াসের ভিত্তিতে কার্যের অসম্পূর্ণ কারণ) ।কিন্তু লাভবান হওয়ার এবং ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকার প্রবণতা প্রবণতা মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা।অতএব এহেন দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করা অপরিহার্য।

এ প্রমাণটি যা ব্যতিক্রমী যুক্তি (قیاس الستثنائی) পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে. বিশেষ যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণে হল, বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকরী বিধি-বিধান এবং তাদের

মূল, কিয়াসের ভিত্তিতে অপরিহার্যতা বা কার্যের (কা ত ফল) কারণ (ঐচ্ছিক কর্ম) সম্পর্কিত।

আমাদের বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যবহৃত প্রমাণটিকেও এরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে যদি মানবীয় উৎকর্ষে পৌছা মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা হয়ে থাকে, তবে যে বিশ্বদৃষ্টি মানুষের আত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত, তার মূলনীতির শনাক্তকরণ অপরিহার্য ।কিন্তু উৎকর্ষ সাধন ফিতরাতগত চাহিদার অন্তর্ভূক্ত ।অতএব উল্লেখিত মূলনীতির শনাক্তকরণ অপরিহার্য।

৫. লেখকের অপর একটি বই দর্শন শিক্ষাতে (অ'মুজেশে ফলসাফে) পরিচিতি(শেনা'খত) নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ।

৬. প্রথমে বিমূর্তন অতঃপর সম্প্রসারণ।অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি প্রথমে কোন গুণকে নির্দিষ্ট করে, অতঃপর একে সার্বজনীনতা দিয়ে থাকে ।

৭. তবে ব্যতিক্রম কোন ব্যক্তি যিনি সচেতন অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী, তাকে অস্বীকার করা যায় না । যেমন: পবিত্র নবীগণ (আ.) ও ইমামগণের (আ.) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস যে, শশবেও এ ধরণের অন্তর্জ্ঞানরে অধিকারী ছিলেন।এমনকি তাদের কেউ কেউ মাতৃগর্ভেও এ ধরণের পরিচিতির অধিকারী ছিলেন।

৮. সূরা রুম- ৩০ ।(فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)

৯. জায়গা দখল, আরশ থেকে অধঃগমন এবং চর্মচক্ষুর মাধ্যমে দর্শনযোগ্য এ ধারণা পোষণ করে থাকেন আহলে সুন্নাতের একটি বিশেষ গোষ্ঠি ।আর বিবর্তন ও বিকাশের ধারণা পোষণ করে থাকেন হেগেল, বার্গসন, উইলিয়াম জিমস ও ওয়াইটহেডের মত পশ্চিমা দার্শনিকগণ । তবে মনে রাখা উচিৎ যে, গতি ও অবস্থার পরিবর্তনকে খোদা থেকে নিষিদ্ধ করণের অর্থ এনয় যে, তিনি স্থির ও অনড় । বরং তার সত্তাগত স্থিতিকে (ثبات) বুঝান হয়েছে এবং স্থিতি হল পরিবর্তনের বিপরীত (نقيض), কিন্তু স্থিরতা ও

গতির সম্পর্ক হল (عدم الملكه) আর গতিশীলতায় সক্ষম কোন কিছু ব্যতীত এ গুণে গুণান্বিত হয় না ।

১০. মনে রাখতে হবে সৃষ্টির পূর্ণতার অধিকারী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাদের বস্তুগত বশিষ্ট্য ও (যেমন: দেহ ও মানুষ) খোদার জন্য সত্য হবে ।কারণ এ বশিষ্ট্যগুলো সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বশীলের প্রমাণ বহন করে । ফলে পরিপূর্ণ ও অসীম অস্তিত্বের অধিকারী খোদার জন্য এটা সত্য হতে পারে না ।

১১. মহান আল্লাহ স্বাধীন নির্বস্তুক অস্তিত্ব, অতএব মহান আল্লাহ ও জ্ঞানের অধিকারী।

১২. যথা সূরা বাকারা- ১৮৭, ২৩৫; আনফাল- ৬৬; ফাতহ- ১৮, ২৭; আল ইমরান- ১৪০-১৪২; মায়িদাহ- ৭৪; তওবাহ- ১৬; মুহাম্মদ- ৩১ ইত্যাদি ।

১৩. যেমন এ আয়াত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে- (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) অর্থাৎ তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহর চান পরলোকের কল্যাণ (সূরা আনফাল- ৬৭) ।

১৪. সূরা হুদ- ৭, ১০৮, ১১৯; কাহাফ- ৭; মূলক- ২; যারিয়াত- ২৩, ৫৬; জাসিয়াহ- ২৩; আল ইমরান- ১৫; তওবাহ- ৭২।

১৫. যেমন: আইনেষ্টাইন, মরিসন, আল্যাক্সিস কার্ল ও অন্যান্য প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ খোদার অস্তিত্ব শিরোনাম প্রবন্ধে লিখেছেন।

১৬. হিন্দু যোগীরা আত্মিকশক্তিকে অপব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দেয়। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অবৈধ।

১৭. আরেফগণ ক্রিয়াগত একত্ববাদকে এ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন ।

১৮. সূরা হুদ- ৭; সূরা মুলক- ২; সূরা কাহাফ; সুরা যারিয়াত- ৫৬; সূরা তওবাহ- ৭২ ।

১৯. ক্বাযা ও প্রভুর ইরাদার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (বিষয়বস্তু হিসেবে) সূরা আল ইমরানের ৪৭তম আয়াতকে সূরা ইয়াছিনের ৮২তম আয়াতের উপর সমাপতনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়।

সূচীপত্র

দ্বীন অর্থ কী ৬

দ্বীনের অনুসন্ধানের ১১

প্রকৃত মানুষ হওয়ার শর্ত. ১৮

বিশ্বদৃষ্টি মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান. ২৩

খোদাপরিচিতি. ২৯

খোদা পরিচিতির সরল উপায় ৩৩

অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণকরণ ৩৯

আল্লাহর গুণসমূহ ৪৬

সত্তাগত গুণাবলী ৫৩

ক্রিয়াগত গুণাবলী. ৬০

অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণাবলী. ৬৬

বিচ্যুতির কারণসমূহের পর্যলোচনা ৭২

কয়েকটি ভুল ধারণার অপনোদন ৭৭

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি এবং এর ত্রুটি নির্দেশ. ৮৩

দ্বান্দ্বিক বস্তবাদ ও তার ত্রুটি নির্দেশ. ৮৮

আল্লাহর একত্ব ৯৫

তাওহীদের অর্থ কী ? ১০১

জাবর ও এখতিয়ার. 109

ক্বাযা ও ক্বাদার ১১৫

আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ১২৪

তথ্যসূত্র ১৩৪